বাংলাদেশ ২০২১

শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি

Safety & Rights

বাংলাদেশ ২০২১

শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি

People Change the World Diakonia

Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি ২০২১

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
৬/৫ এ স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮ ০১৯৭৪৬৬৬৮৯০
ই-মেইল : info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট: www.safetyandrights.org

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২২

স্বত্ব
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

আলোকচিত্র
ইন্টারনেট

দাম
১০০ টাকা

The State of Labour and Labour Economy of Bangladesh 2021

Documentation, Editing and Publication
Safety and Rights Society (SRS)
6/5 A Sir Syed Road
Mohammadpur, Dhaka 1207
Mobile: +88 01974666890
info@safetyandrights.org
www.safetyandrights.org
Safety and Rights Society
Safety and Rights Society

Date of Publication
January 2022

Price
100 Tk.

Copyright
Safety and Rights Society (SRS)

ISBN: 978-984-35-1686-2

সূচি

সম্পাদকীয় ০৪

বাংলাদেশ ২০২১: মহামারি আর দ্রব্যমূল্যে বিপর্যস্ত হওয়ার বছর ০৫

নারায়ণগঞ্জে সেজান জুস কারখানায় অগ্নিকান্ড ০৯

বাঁশখালী বিদ্যুতকেন্দ্রে আবারও শ্রমজীবীর মৃত্যু ১৪

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধান: মহামারিতে বেকার ২৬ লাখের বেশি মানুষ ১৮

চাল ও তেলেরর দাম হয়ে উঠেছে শ্রমিক জীবনের দীর্ঘশ্বাস ২০

বাজেট বরাদ্দ শ্রম খাত সবার পেছনে ২২

২০২১ সালে শ্রমিকদের মাথাপিছু আয়ও কি তবে বেড়েছে? ২৬

'লকডাউন'কালে পোশাক শ্রমিকদের পুনঃপুন হয়রানি ২৯

ভূমধ্যসাগরে ডুবছে আর ভাসছে বাংলাদেশী তরুণরা ৩১

মহামারির ধাক্কায় কাজ হারিয়ে প্রবাসীদের একাংশ দেশে ফিরেছেন: সরকার ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করেছে ৩৩

চা শিল্পে মজুরি অসন্তোষের সঙ্গে ছিল করোনাভীতি ও ঝুঁকি: অথচ উৎপাদনে রেকর্ড ৩৫

চামড়া শিল্পখাতে অনিশ্চয়তার প্রত্যাবর্তন ৩৮

কয়লা শ্রমিকদের ঝুঁকি ভরা জীবন ৪০

ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক চালকদের দেশব্যাপী আন্দোলন ৪৩

মৎস্যজীবীদের বিকল্প কাজের প্রশিক্ষণ জরুরি ৪৫

গ্যাস দুর্ঘটনার মহামারি থামানোর কেউ নেই; মৃত্যুর দায়িত্ব নিচ্ছে না কেউ ৪৭

নীরবে মহামারির বড় শিকার হলো গৃহশ্রমিক ৪৯

রাষ্ট্রের বন্ধ পাটকল ইজারার কথা শোনা গেল ৫১

মহামারিতে তাঁতশিল্পে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ৫৪

নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় মনযোগ প্রয়োজন ৫৬

চিনিকলের শ্রমিক কর্মচারি ও আখচাষীদের বছরজুড়ে উদ্বেগ ৫৮

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি ৬১

সর্বজনীন পেনশন নিয়ে অনিশ্চয়তা: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী-প্রবীণরা অসহায় ৬৪

জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে শ্রমজীবীরা দিশেহারা: নিরুপায় হয়ে শহরে ৬৭

Workers face harder time for price hike of essentials during pandemic ৭০

Workplace ordeals of coal workers ৭৪

Workers become climate refugees in city ৭৭

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের জীবনযাপনের বিবেচনায় 'নতুন বছর' কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনে না সচরাচর। তারপরও ২০২২ চলে এলো। তাকে বরণ করে নিতেই হবে। ২০২১-এর জানুয়ারির চেয়ে এই জানুয়ারি কিছুটা বাড়তি স্বস্তির বটে। মহামারির ব্যাপকতা কমে আসার লক্ষণের মাঝে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। মহামরি আর ফিরে না আসুক এই কামনা করছি।

শ্রমিকদের নতুন বছর মানে নতুন করে জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতি। যেকোন প্রস্তুতির জন্য প্রাথমিক যে শর্ত থাকে মহামারি বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের সে প্রাথমিক অর্থনৈতিক ভিত্তিও নড়বড়ে করে দিয়েছিল। কেবল কর্মহীনতা আর ক্ষুধাই নয়– মহামারির দু বছর বাংলাদেশের শ্রমজীবীরা তাদের অপমানিত জীবনের স্বরূপও দেখেছে বারবার। লকডাউন জারি আর উঠানোর নামে তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল সেতো ভুলবার নয়। আর এখন শুরু হয়েছে মহামারি উত্তর মূল্যস্ফীতির ছোবল। ২০২১ থেকে ২০২২ যেন জ্বলন্ত কড়াই থেকে ফুটন্ত উনুনে পড়ে যাওয়ার মতো।

সেইফটি এন্ড রাইটস প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রম বর্ষপত্র প্রকাশ করছে। নানান বিষয়ে এরকম বর্ষপত্র প্রকাশিত হয় বাংলাদেশে। আমরা শুধু কিছু চুম্বক দৃশ্য তুলে আনি শ্রমিক জীবন ও শ্রম বাজারের গতিশীলতা সম্পর্কে। সাধারণভাবে মোটেই আনন্দদায়ক কোন সংবাদ থাকে না এই বাৎসরিক সংকলনে। তারপরও এই কাজটি সেইফটি এন্ড রাইটস করে ভালোবেসে, আন্তরিকভাবে, দায়িত্ব আকারে। পাতায় পাতায় কিছু চুম্বক দৃশ্যের ভেতর আমরা ইতিহাসের মহাফেজখানায় বাংলাদেশের শ্রমিকদের অতীত ও বর্তমানকে জমা রেখে যাওয়ার ক্ষুদ্র লক্ষ্য নিয়েছি কেবল। যে গবেষক, যে নীতিনির্ধারক এখানকার শ্রমিক জীবন নিয়ে কিছু করতে চাইবেন তাদের জন্য কেবল চিন্তা-ভাবনা-বোঝাপড়ার কিছু খোরাক রেখে যেতে চাই আমরা।

এবারও কম বেশি ২৫-৩০টি লেখা থাকছে এই সংকলনে। ক্রমে আমরা শ্রমখাতের বৈচিত্র্য ধরার চেষ্টা করছি। চেষ্টা আছে সংকটের ব্যাপকতা তুলে ধরারও। যে কারণে কয়লা শ্রমিকের জীবন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনে উপচেপড়া বস্তিজীবন পর্যন্ত আমরা পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ করতে তৎপর। তবে বরাবরের মতো বাজেট বিশ্লেষণসহ নিয়মিত বিষয়গুলোও বাদ পড়েনি এই সংকলন থেকে।

মনযোগী পাঠক এই সংকলনকে যদি সেইফটি এন্ড রাইটস-এর বিগত বছরের সংকলনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন– তাহলে নেতিবাচক এক উপসংহারেই আসতে হয়। বিশেষ করে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও মজুরির প্রশ্নে। একদিকে যেমন বাংলাদেশে শ্রমিক মজুরি স্থির হয়ে আছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তীব্রতার মাঝেও– তেমনি কলকারখানায় জ্বলেপুড়ে মরার ধারাও বন্ধ করতে পারছি না আমরা। ২০২২ তাই এলো বিপুল দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে। শ্রমিকদের জন্য শোভন কাজের পরিবেশ এবং জীবন যাপনের উপযোগী মজুরি ছাড়া বাংলাদেশ কীভাবে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হবে? কেনই বা হবে?

সেকেন্দার আলী মিনা
নির্বাহী পরিচালক
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

বাংলাদেশ ২০২১

মহামারি আর দ্রব্যমূল্যে বিপর্যস্ত হওয়ার বছর

২০২১ সালের কথা বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের বহুকাল মনে থাকবে। এত দীর্ঘ দুঃসময় সমকালীন ইতিহাসে কমই দেখেছে তারা। মহামারিতে আগের বছরের কষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এ বছরের অর্থনৈতিক কষ্ট। ক্রমাগত লকডাউন, কর্মহীনতা এবং অর্থকড়ির সংকটে পড়ে বিপন্ন হয়েছে শ্রমজীবী পরিবারগুলো। বছর শেষে যদিও কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিক হচ্ছিলো– কিন্তু কাজ হারানো অনেকে পুরানো অবস্থা আর ফিরে পায়নি। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের অবিশ্বাস্য উলম্ফন তাদের দুর্যোগে ফেলে দেয় নতুন করে। শ্রমজীবীদের অনেকে দু'বছরের সংকটে বিপুলভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন অবস্থা তাদের ঋণগ্রস্ততাকে দুঃসহ করেছে।

শ্রমিকদের আয়-ব্যয়-ভোগ কমে যাওয়ার বছর

২০২১ সালের বাংলাদেশের প্রধান ঘটনা অবশ্যই মহামারির বিস্তার এবং তার থেকে আপাত মুক্তির ঘটনা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ বছর কর্মহীন মানুষদের 'লকডাউনে' কাটাতে হয়েছে। স্বকর্মে নিয়োজিতরা কাজে যেতে পারেননি। অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত অনেকে ছাটাই হয়েছে। পণ্যের চাহিদা ও বিপণন কমে যাওয়ায় উৎপাদনে ধস নামার বছর ছিল এটা। বেকার হন কোটি কোটি মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্য সংকুচিত হওয়ায় শ্রমের দাম এসময় কমে আসে এবং তাতে শ্রমিকদের দরকষাকষির সামর্থ্য কমে যায়। তাদের আয়, ব্যয় ও ভোগ– সবই এসময় কমে।

২০২০-এর মার্চে বাংলাদেশে প্রথম এই মহামারির সংক্রমণ ঘটেছিল। আর তার রেশ ২০২১-এর শেষেও ধীরলয়ে অব্যাহত ছিল। দুই বছরে কোটির অধিক বাংলাদেশীকে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করতে হয়েছে। তার মাঝে প্রায় ১৬ লাখ মানুষ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। মারা গেছে সরকারি হিসাবে প্রায় ২৮ হাজার মানুষ। মৃতদের মধ্যে বড় এক অংশ ছিল সমাজের শ্রমজীবী মানুষ। যেহেতু এই ভাইরাস সাধারণভাবে মানুষ থেকে মানুষের সংস্পর্শে ছড়ায় সেকারণে কাজের প্রয়োজনে নিরূপায় হয়ে বের হওয়া নারী-পুরুষরা তাতে আক্রান্ত হয়েছে বেশি করে। করোনার সংক্রমণের শিকার অনেক শ্রমজীবী পরিবার চিকিৎসার ব্যয়ভার সামলাতে যেয়ে নতুন করে ঋণগ্রস্ত হয়েছে। অনেকে শহর ছেড়ে বছরের শুরুতে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ আবার বছর শেষে শহরে ফিরছিলো।

উচ্চশিক্ষিতদের বেকারত্ব অবিশ্বাস্য মাত্রায়

করোনার মাঝে ২০২১-এ এবং আগের বছর বেকারত্ব কতটা বেড়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা অনেকগুলো জরিপ করেছে। ২০২১-এর প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আগের বছরের এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে জানা যায়, ২৬ লাখের বেশি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে করোনায়। যেহেতু পরের বছরও করোনা অব্যাহত ছিল সে কারণে ঐ বেকাররা যে ২০২১-এর শুরুতে কাজ পায়নি তা অনুমানযোগ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঐ অনুসন্ধানে বলা হয়েছিল– কোভিডের প্রভাবে শিল্পখাতে কর্মচ্যুতির হার ছিল ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। জানুয়ারিতে ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তরুণদের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখতে পেয়েছিল, মহামারির আগে চাকুরিতে নিযুক্ত থাকলেও তরুণ-তরুণীদের ১৫ শতাংশ মহামারির পর কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে বেকারত্বের বড় এক থাবা পড়েছে উচ্চশিক্ষিতদের মাঝেও। সাম্প্রতিক ৪১তম বিসিএস-এ দেখা গেল প্রায় ২২০০ শূন্যপদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা পৌনে পাঁচ লাখ। অর্থাৎ একটা চাকুরির বিপরীতে আবেদন করছে দুই শতের বেশি তরুণ-তরুণী। ৪৩তম বিসিএসে প্রতি পদে প্রার্থী ছিল ২৪৪ জন। অর্থাৎ ২৪৩ জনই এই যুদ্ধে বাদ পড়বে। এরকম তরুণ-তরুণীদের কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা ২০২১ ছাড়িয়ে ২০২২-এ আরো বাড়বে বলেই অনুমান করা যায়।

বিশ্ব ক্ষুধা-সূচকে বাংলাদেশ ৭৬ নম্বর অবস্থানে

কর্মহীনতা ও ক্ষুধা সবসময় হাত ধরাধরি করে চলে। এবার বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশকে ৭৬ তম স্থানে দেখা গেছে। গত বছরের চেয়ে এটা এক ধাপ পেছনে। পাশের দেশ মিয়ানমারও বাংলাদেশের চেয়ে সূচকে ৫ ধাপ এগিয়ে ছিল এবার।

আলোচ্য এ সূচকে স্কোর 'শূন্য' মানে ক্ষুধা নেই। স্কোর '১০০' হলে ক্ষুধার মাত্রা সর্বোচ্চ বুঝতে হবে। বাংলাদেশের অবস্থান 'গুরুতর' পর্যায়ের চেয়ে কিছুটা ভালো। এই সূচকের বিবরণে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ২৮ ভাগের উচ্চতা এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে কম। সাধারণত বস্তি এলাকায় শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের মাঝে এরকম প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যদি খর্বতার সমস্যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর হয় তাহলে বলতে হবে বাংলাদেশের এই দরিদ্র পরিবারগুলো খর্বতার একটা দুষ্টচক্রে প্রবেশ করছে। তারা বেঁটে হতে থাকবে।

দ্রব্যমূল্যের উলম্ফন

দরিদ্ররা যে কম খায় বা খাবার কম পায় তার একটা বড় কারণ আয়ের তুলনায় খাদ্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি। পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ের চেয়ে সরু ও মাঝারি চাল ১২ শতাংশ ও মোটা চাল ১৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে ২০২১ সালে। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালের দাম সবসময় উর্ধ্বমুখী থেকেছে। পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বিভিন্ন মানের চাল কেজিতে গড়ে ন্যূনতম ৫ টাকা এবং উর্ধ্বে ১৫ টাকার বেশিতে বিক্রি হয়েছে। আটার দামও কমপক্ষে কেজিতে ৫ টাকা বেড়েছে। ডালের দাম বেড়েছে কেজিতে ২০ টাকা। ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিপ্রতি গত বছরের চেয়ে ৬০-৭০ টাকা বেড়েছে। একইভাবে তেল, পেয়াজ, চিনি ইত্যাদি পণ্যের দামও অনেক বেড়েছে। মজুরি স্থির থাকাবস্থায় প্রয়োজনীয় পণ্যের এরকম দফায় দফায় দাম বাড়ায় শ্রমজীবীদের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। দ্রব্যমূলের এরকম নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধি শ্রমিক পরিবারগুলোর অবস্থা দুঃসহ করেছে ২০২১ সালে। দ্রব্যমূল্যের এই অবস্থা বজায় ছিল জ্বালানির দাম বাড়ার আগেই। বছরের শেষে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বৃদ্ধিকে অজুহাত করে পরিবহনখাতের মালিক ও শ্রমিকরা ধর্মঘট-অস্ত্র ব্যবহার করে যাত্রী-ভাড়া নতুন করে প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে নেয়। ৩ নভেম্বর হঠাৎ এক ঘোষণাতে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়। এসবের প্রতিক্রিয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সকল পণ্যের দাম আরেক দফা বাড়ে।

কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে তীব্র গতিতে

করোনাকালে শ্রমজীবীসহ দেশের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বেশির ভাগ মানুষের আয় কমা এবং দ্রব্যমূল্যে নাভিশ্বাস অবস্থা দেখা গেলেও ছোট একটা গোষ্ঠীর আয় বেড়েছে বিপুলভাবে। এদের এক অংশ নতুন করে কোটিপতির খাতায় নাম লিখিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, করোনার মহামারি চলাকালে গত এক বছরে দেশে কোটিপতি আমানতধারী ব্যাংক হিসাব বেড়েছে সাড়ে ১১ হাজারেরও অধিক, যা স্বাভাবিক সময়ের বৃদ্ধির চেয়ে অধিক গতির বৃদ্ধি (২৫ জুলাই ২০২১; কালের কণ্ঠ)।

২০২১ সালের মার্চ শেষে দেশের ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪ হাজার ২৭২। ২০১৯ সালের মার্চ থেকে ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশে কোটিপতি আমানতকারী বেড়েছিল মাত্র ছয় হাজার ৩৪৯ জন। আর ২০২০ সালের পুরো সময়ে বেড়েছিল এক হাজার ৫১ জন। এর মানে দাঁড়ায় করোনাকালে কোটিপতি আমানতকারীর হিসাবের প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

করোনার আগেই বাংলাদেশের সমাজের ওপরের দিকের ১০ শতাংশ মানুষের আয় নিচের দিকের ৪০ শতাংশ মানুষের আয়ের চেয়ে বেশি ছিল। ২০২০ সালের শুরুতে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল প্রায় ৩ কোটি ৩৪ লাখ। স্বভাবত ২০২১-এ সমাজে ধন ও শ্রেণী বৈষম্য আরও তীব্রতা পেয়েছে।

টিকায় অগ্রাধিকার পেলো না সকল খাতের শ্রমিকরা

বাংলাদেশের সমাজে ধনী-দরিদ্রে এবং বিশেষভাবে শ্রমজীবীদের প্রতি বৈষম্যের সর্বশেষ বড় চিত্র দেখা গেছে করোনাকালে টিকাদানের মধ্যেও। করোনার মাঝে শ্রমঘন খাতগুলোকে চালু রাখার চেষ্টা ছিল। আবার লকডাউন ওঠার পর পুরোপুরি এসব খাত চালু হলেও টিকাদানের অগ্রাধিকারে প্রথম দিকে শ্রমিকদের রাখা

হয়নি। পরে শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য জরুরিভিত্তিতে টিকার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হলেও অন্যান্য কোন খাতে তেমন ঘটনে দেখা যায়নি।

দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছয় কোটি ৩৫ লাখ বলে প্রচারিত রয়েছে। এর মধ্যে এক কোটি ২৫ লাখ শ্রমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতে কাজ করছে বলে জানিয়েছে ২০২১-এর ২ আগস্ট দৈনিক সমকাল। কিন্তু পোশাক খাতের নেতাদের দাবির মুখে এ খাতের শ্রমিকরা টিকা পেলেও অন্যান্য রপ্তানি ও শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বিষয়ে টিকার অনিশ্চয়তা কাটেনি বছর শেষেও। ফলে ঝুঁকিতে কাজ করছিলেন তাঁরা

সংখ্যা বাড়ছে নতুন দরিদ্রদের

যদিও করোনার তীব্রতা আপাতত ২০২১-এর শেষ দিকে আর দেখা যাচ্ছিলো না– কিন্তু সংক্রমণ ও মৃত্যু কিছুই পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। পাশ্ববর্তী ভারতে মাঝে মাঝেই ভাইরাসের নতুন সংস্করণ শনাক্ত হচ্ছিলো। এর মাঝেই অর্থনৈতিক কাজ কারবার শুরু হয়ে গেছে দেশজুড়ে। তবে করোনা-উত্তর অর্থনীতিতে ভোগ ও চাহিদার চাপ বাড়লেও শ্রমিক চাহিদা বেড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে জ্বালানির অকল্পনীয় দাম বৃদ্ধি অর্থনীতিকে নজিরবিহীনভাবে চাপে ফেলে দেয় নতুন করে। জ্বালানির দাম বাড়ানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) যৌথ জরিপে জানা যায়, ২০২১-এর মার্চ মাসে দেশে করোনাজনিত নতুন দরিদ্রের সংখ্যা ছিল যেখানে ২ কোটি ৪৫ লাখ - সেটা ছয় মাস পর দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ২৪ লাখ। আলোচ্য এই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাকালে দারিদ্র্যের কারণে দেশের ২৮ শতাংশ মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ মানুষ শহরে আবার ফিরে এসেছে। ১০ শতাংশ মানুষ এখনো শহরে ফিরতে পারেনি।

শ্রমিক জীবনের সংকটের তুলনায় শ্রম আন্দোলন ছিল সীমিত

শ্রমখাতে ২০২১-কে তুলনামূলকভাবে আন্দোলনহীনতার বছরও বলা যায়। এ বছর দীর্ঘমেয়াদে আন্দোলন ছিল কেবল পাটকল খাতে। সেখানে বন্ধ করে দেওয়া পাটকল শ্রমিকদের একাংশের বকেয়া মজুরি নিয়ে লাগাতার মিছিল মিটিং হয়েছে। এসব শ্রমিকরা বন্ধ কারখানাগুলো খুলে দেয়ারও দাবি জানাচ্ছিলো। এছাড়া গাজিপুরের স্টাইলক্র্যাপ্টসহ গার্মেন্ট খাতের আরও কিছু কারখানায় বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন হয়েছে। স্ট্যাইল ক্রাফটের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবনের সামনে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো নভেম্বরে। এসবের বাইরে ২০২১-এ শ্রমখাত ছিল পদ্ধতিগতভাবে আন্দোলনহীন। এই আন্দোলনহীনতা মজুরি ও কাজের পরিবেশের সন্তুষ্টির কারণে ছিল না। ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিম্নরঙ্গতার কারণে। যেহেতু দেশে রাজনৈতিক পরিসরে বদ্ধ অবস্থা বজায় ছিল সেকারণে শ্রমিক অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলোতেও তার ছাপ পড়ে। শ্রম দুর্ঘটনাগুলোতে বিবৃতি দেয়া ছাড়া মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোতে শ্রমিক স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদে কোন কর্মকান্ড জাতীয়ভাবে দৃশ্যগোচর হয়নি। এর কিছুটা ব্যতিক্রম হিসেবে বামপন্থী কয়েকটি দলকে বিভিন্ন খাতের শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার চেষ্টা চালাতে দেখা গেছে। কিন্তু সেটা জাতীয়ভাবে কোন আন্দোলনের তরঙ্গ তুলতে পারেনি।

রপ্তানি বাড়ার বছর ২০২১-এ শ্রমিক মজুরিতে প্রবৃদ্ধি ছিলো না

এরূপ শ্রমিক আন্দোলনহীনতার বিপরীতে আরেকটি চিত্র হিসেবে দেখা গেছে বিভিন্ন শিল্পখাতে রপ্তানি আয় বাড়লেও ঐসব খাতের শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনায় তার কোন ইতিবাচক ছাপ পড়েনি। যেমন চা খাতে এবছর রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে। অথচ চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল দেশের শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় সর্বনিম্ন। ২০২১-এর ৩ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক জানায়, এই অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। পাশাপাশি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২ দশমিক ৬২ শতাংশ। অথচ একই সময়ে শ্রমজীবীদের মজুরি বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক কোন পদক্ষেপ বা ঘোষনা ছিল না।

জলবায়ু উদ্বাস্তু শ্রমজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত

২০২১ সালে শ্রমখাতের উদীয়মান আরেক নীরব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সংখ্যাবৃদ্ধি। দেশের আবহাওয়ার মৌসুমি চক্রে অস্বাভাবিক নানান পরিবর্তন বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে এবছর। ফলে কৃষিখাতে পুরানো পদ্ধতির গ্রামীণ চাষবাসে সমস্যা তৈরি হচ্ছিলো। যা সেখানে বাড়তি কর্মহীনতা তৈরি করছিল। করোনার লকডাউন উঠে যাওয়া মাত্র গ্রাম থেকে বেশি বেশি হারে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের শহরমুখী হতে দেখা যায়।

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরীপ

২০২১-এ কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৫৩৮

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ওপর ভিত্তি করে সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় বিগত ১ বছরে (১ জানুয়ারী -৩১ ডিসেম্বর, ২০২১) সারাদেশে ৩৯৯ টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৫৩৮ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। জরিপ থেকে আরও জানা যায় ২০২০ সালে অনুরূপ ৩৭৩ টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় মোট ৪৩২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, করোনা মহামারীর ২য় বছরেও গত এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত মোট প্রায় ৫ মাস বিভিন্ন সময়ে সাধারন ছুটিসহ নানাবিধ বিধিনিষেধ বলবৎ ছিল ফলে শ্রমিকেরা নিয়মিত কাজ করতে পারেনি। বছরের বাকী সময়ে কাজ করলেও কর্মদুর্ঘটনার পরিমাণ অন্য যে কোন স্বাভাবিক বছরের তুলনায় কম নয়। বরং অগ্নি দুর্ঘটনার সংখ্যা বেশিই ছিল। যার মধ্যে ৭ জুলাই রূপগঞ্জে সেজান জুস কারখানার অগ্নিকাণ্ডে, নিহত ৫২ জন শ্রমিক, ৪ নভেম্বর সোয়ারীঘাটে রোমানা রাবার কারখানার অগ্নিকাণ্ড, নিহত ৫ জন এবং ১৩ ডিসেম্বর বগুড়ার সান্তাহারে প্লাস্টিক কারখানার অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৫ জন, উল্লেখযোগ্য।

২৬টি দৈনিক সংবাদপত্রে (১৫টি জাতীয় এবং ১১টি স্থানীয়) প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এসআরএস এ জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যেসকল শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে অথবা কর্মক্ষেত্র থেকে আসা-যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় অথবা অন্য কোন কারণে মারা গিয়েছেন তাদের এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে যাদের সংখ্যা মোট ১৫০ জন। এর পরেই রয়েছে নির্মাণ খাত এই খাতে নিহত হয়েছে ১৩৮ জন, কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে ১১২ জন, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে (যেমন- ওয়ার্কশপ, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ৮৬ জন, এবং কৃষি খাতে এই সংখ্যা ৫২ জন।

মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫৬ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৮২ জন; আগুনে পুড়ে ৭২ জন; ছাদ, মাঁচা বা উপর থেকে পড়ে মারা গেছে ৫৮ জন; বজ্রপাতে ৪৯ জন; শক্ত বা ভারী কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত বা তার নিচে চাপা পড়ে ৩২ জন; রাসায়নিক দ্রব্য বা সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পানির ট্যাঙ্কের বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ৩০ জন; পাহাড় বা মাটি, ব্রিজ, ভবন বা ছাদ, দেয়াল ধসে ২৭ জন; বয়লার বিস্ফোরণে ২৩ জন; । এছাড়া পানিতে ডুবে ৯ জন শ্রমিক নিহত হয়।

জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগে বাধা, বেপোরোয়া যান চলাচল ইত্যাদি হলো পরিবহন দুর্ঘটনার মূল কারণ। কোনরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নিয়েই বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ দেয়া, ভেজা হাতে মটর চালু করা, মাথার ওপরে বয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনের নিচে কাজ করা, ভবনের পাশে দিয়ে বয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তারের পাশ দিয়ে লোহার রড উঠানোকে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিকালে অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে কারখানায় অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা, কারখানায় ভবনে জরুরী বর্হিগমন পথ না থাকা, কারখানা নির্মাণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অনুমতি না নেওয়া, সেইফটি বিষয়ে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ না দেওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসআরএস বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ ও আলোচনার মাধ্যমে কর্মদুর্ঘটনা বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে আসছে। কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। একমাত্র সকলের যৌথ প্রচেষ্টাই পারে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা থেকে শ্রমিকের জীবন বাঁচাতে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান, সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রধান দায়িত্ব মালিকের। মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করার দায়িত্ব সরকারী প্রতিষ্ঠানের। সরকার ও মালিক উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কর্মদুর্ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব হবে।

নারায়ণগঞ্জে সেজান জুস কারখানায় অগ্নিকান্ড

অর্ধশত শ্রমিক আবারও কর্মস্থলে আগুণে পুড়ে ছাই হলো কারখানা মালিকের জামিন দু সপ্তাহের মধ্যে

২০২১ সালের বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত শিল্প-দুর্ঘটনা ছিল সজীব গ্রুপের জুস তৈরির কারখানায় প্রায় ৫০ জন শ্রমিকের আগুনে পুড়ে মৃত্যু। নারায়ণগঞ্জের এই কারখানাটিতে 'সেজান' ব্র্যান্ডের জুস তৈরি হতো বলে প্রচারমাধ্যমে জানা যায়। ২০২১-এর ৮ জুলাই এখানে আগুন লাগে। আগুন লাগার পর বোঝা যায় দেশজুড়ে ভাইরাস প্রতিরোধী লকডাউনে সব কিছু বন্ধের মাঝেও এই কারখানায় শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিলো এবং কাজের সময় দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ফলে শ্রমিকরা আগুনের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি বরং পুড়ে কয়লা হয়েছে। তাদের লাশ শনাক্তও দুরূহ হয়ে যায়। পরে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রযুক্তিগত সহায়তায় ৪৫ জনের লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং তাদের মরদেহ নিকটজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে ঘটনার দীর্ঘপর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিবেদন সূত্রে (৯ সেপ্টেম্বর ২০২১) জানা যায় এই কারখানার পুড়ে যাওয়া জিনিসপত্রের ভেতর একাধিক মাথার খুলি পাওয়া গেছে। আবার প্রাপ্ত লাশের মাঝে তাদের নিখোঁজ স্বজনদের লাশ নেই বলে অভিযোগ করছিল অন্তত তিনটি পরিবার।

উল্লেখ্য, আগুনে ভবন থেকে ৪৯ জনের প্রায় শনাক্ত অযোগ্য মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কোন কোন সংবাদপত্রে এটা ৪৮ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আগুন লাগার পর জীবন বাঁচাতে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েও কয়েকজন শ্রমিক মারা গেছে। ভবনে বিভিন্ন ধরনের মালপত্র, রাসায়নিক ও তৈরি পণ্য একসঙ্গে থাকার কারণে আগুন ভয়াবহ হয়েছে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়।

আগুন লাগার পর শ্রমিক ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কর্ণগোপ এলাকায় অবস্থিত সজীব গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সেজান জুস কারখানায় বিভিন্নভাবে প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করতো। ঘটনার দিন সাততলা ভবনে থাকা কারখানাটির নিচতলায় হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখা বাড়তে শুরু করে। একপর্যায়ে আগুন পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় কালো ধোঁয়ায় পুরো কারখানা অন্ধকার হয়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে শ্রমিকরা চিৎকার ও ছোটাছুটি শুরু করে। কেউ কেউ ভবনের ছাদে অবস্থান নেয়। আবার কেউ কেউ ছাদ থেকে লাফ দেন। ভবনটির চতুর্থ তলার সিঁড়ির

গেইট বন্ধ থাকায় সেখান থেকে কোনো শ্রমিক বের হতে পারেনি। বেশির ভাগ লাশ উদ্ধার হয় ওই ফ্লোর থেকে।

আগুনে পুড়ে যাওয়া এই কারখানা ভবনের কোথাও জরুরিভাবে কোন বের হওয়ার পথ ও বিকল্প সিঁড়ি ছিল না।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নারায়ণগঞ্জের ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, আগুনের ঘটনায় কতজন নিখোঁজ আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সেই তালিকা তৈরি হবে। স্বজনদের দাবি অনুযায়ী নিখোঁজদের নামও তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। একই সাথে যারা ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা নিয়েছে বা নিচ্ছে তাদেরও তালিকা তৈরির কাজ চলছে বলে তিনি জানান।

ঘটনার পরদিন দৈনিক বাংলা ট্রিবিউনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মালিক পরিবারের এম এ হাসেম বলেছিলেন, 'যে কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটির ইনস্যুরেন্স করা আছে। ভয়ের কারণ নেই।' তাঁর এই সাক্ষাৎকারের পর জানা যায় হাসেম ফুডস কমপ্লেক্সের প্রায় সব কারখানা ভবন ও অন্যান্য সম্পদ বীমার আওতায় থাকলেও শ্রম আইনের আলোকে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য গ্রুপবীমা ছিল না। এতে অগ্নিকান্ডে হতাহত শ্রমিকদের পরিবারের বীমা কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

শ্রম আইন ২০০৬-এ বলা হয়েছে, শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যেসব প্রতিষ্ঠানে অন্তত ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত তাদের জন্য বিমা আইন অনুযায়ী গ্রুপ বিমা থাকতে হবে।

এদিকে ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া দেশের নীতিনির্ধারকদের অনেকেই সাংবাদিকদের তখন বলেছিলেন, 'এ ঘটনায় দায়ী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' কিন্তু প্রাথমিকভাবে কারখানার মালিকরা আটক হলেও দ্রুতই তাদের জামিন পেয়ে যেতে দেখা যায়। ঘটনার পরদিন রাতে উপজেলার ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর নাজিম উদ্দিন বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় আসামি করা হয় হাসেম ফুডের মূল মালিক সজীব গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ হাসেম, তার চার ছেলে ও কারখানার তিন কর্মকর্তাকে। মামলার পর ১০ জুলাই হাসেমকে গুলশানের বাসা থেকে আটক করা হয়। একই সঙ্গে আরও সাত জন গ্রেফতার হন। গ্রেপ্তারকৃত আটজন ছিলেন সজীব গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল হাসেম (৭০), তার ছেলে হাসীব বিন হাসেম ওরফে সজীব (৩৯), তারেক ইব্রাহীম (৩৫), তাওসীব ইব্রাহীম (৩৩), তানজীম ইব্রাহীম (২১), শাহান শান আজাদ (৪৩), মামুনুর রশিদ (৫৩) ও মো. সালাউদ্দিন (৩০)।

আটক হলেও ৯ দিনের মাথায় হাসেম পরিবার জামিন পেয়ে যায়। পত্রপত্রিকার তথ্য অনুযায়ী হাসেমের সঙ্গে জামিন পাওয়াদের মধ্যে রয়েছে তার পুত্র তারেক ইব্রাহিম ও হাসিব বিন হাসেম। অপর দুই পুত্র তাওসিফ ইব্রাহিম শীতল ও তানজিম ইব্রাহিম এর আগেই জামিন পেয়ে যায়।

পুলিশের দায়ের করা ঐ মামলার পাশাপাশি শ্রম আদালতে শ্রম আইনের ৮০ ধারায় প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ডিজিএমের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের করেছে জেলা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ। এই মামলার পরিণতি সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি।

এদিকে পুড়ে যাওয়া কারখানাটি পরিদর্শনে গিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, এই ঘটনায় যারা মারা গেছেন, তাদের পরিবার ২ লাখ টাকা পাবে। এছাড়া যারা আহত হয়েছেন, তারা পাবে ৫০ হাজার টাকা।

এর আগে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার ও আহতদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সেজান ফুড কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহত শ্রমিকদের আজীবন আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ ও দায়িদের শাস্তি প্রদানের দাবিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছিল শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।

উল্লেখ্য, শ্রমআইন অনুযায়ী, স্থায়ী শ্রমিকের ক্ষেত্রে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত হলে ক্ষতিপূরণ পাবে দুই লাখ

টাকা। চিরস্থায়ী পঙ্গু হয়ে গেলে পাবে আড়াই লাখ টাকা।

এই ঘটনার পর আব্দুর রহিম নামে একজন শ্রমিক ১০ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাককে বলেছেন, আগুন লাগা এই কারখানায় বেশির ভাগ শ্রমিকের বয়স ছিল ১০ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে। কর্তৃপক্ষ অল্প মজুরির সুবিধার জন্য শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দিত। কারখানায় ছিল না কোনো শ্রমিক ইউনিয়ন। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাও ছিল না। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলছেন, তারা কোনো ফ্লোরে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা দেখতে পাননি।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে সারাকা গার্মেন্টসে আগুনে পুড়ে শ্রমিকের মৃত্যুর যে মিছিল বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের জুলাই মাসে হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজের সেজান জুসের কারখানায় ৫২ জনের মৃত্যুর সর্বশেষ ঘটনায় প্রমাণ হচ্ছে সেই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে পারেনি এখানকার শ্রম পরিদর্শন বিভাগ কিংবা আইন-আদালত-প্রশাসনিক নজরদারি।

সেজান জুস ও শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার সংকট

সেজান জুস কারখানায় অগ্নিকান্ডের পর ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত দল জানায়, কারখানায় অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল না। যা সরাসরি রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার ব্যতিক্রম।

অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থ রাখা ছিল ওখানে। এতে শ্রমিকদের জীবন ঝুঁকির মধ্যেই ছিল। ছয়তলা ওই ভবনের নিচতলা ও ছয়তলা বাদে বাকি চারটি ফ্লোরে চকোলেট, বিস্কুট, কোমল পানীয়, লাচ্ছা সেমাইসহ বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যপণ্য তৈরি হতো। নিচতলায় প্যাকেজিং সামগ্রী ছিল– অত্যন্ত দাহ্য বস্তু। দোতলায় ছিল বেকারি –যেখানে সারি সারি চুল্লিতে প্রচন্ড উত্তাপে বিস্কুট তৈরি হতো। তৃতীয়, চতুর্থ তলায় জুস, পানীয়, ক্যান্ডি, ললিপপ তৈরি, পঞ্চমতলায় আচার তৈরির বড় কড়াইয়ে তেল গরম করা, ষষ্ঠতলায় বিভিন্ন ধরনের দাহ্য পদার্থ এমনকি কয়েক টন ডালডা জাতীয় পদার্থ রাখা ছিল।

এসব বিবরণ থেকে স্পষ্ট, কারখানায় শ্রমিক জীবন যে স্থায়ীভাবে অনিরাপদ হয়ে আছে সেটা দেখার মতো জাতীয়ভাবে কেউ দায়িত্ব পালন করেনি বা ওরকম কেউ ছিলই না।

সেজান জুস কারখানায় আগুন লাগার ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের তালিকা

১. মহিউদ্দিন, পিতা: গোলাম;
২. শামীম, পিতা: খায়রুল ইসলাম;
৩. হাফেজা বেগম, পিতা: ইসমাইল;
৪. ফিরোজা বেগম, পিতা: হাকিম আলী;
৫. নাঈম, পিতা: তাহের উদ্দিন;
৬. শাহিদা বেগম, পিতা: স্বপন;
৭. কম্পা বর্মণ, পিতা: পবা বর্মণ;
৮. মো. রাকিব, পিতা: তাইজুদ্দিন;
৯. খাদিজা বেগম, পিতা: কাইয়ুম;
১০. শান্তামনি, পিতা: জাকির হোসেন;
১১. উর্মিতা বেগম, পিতা; সেলিম;
১২. আকিমা বেগম, পিতা: কাইয়ুম;
১৩. হিমা আক্তার, পিতা; কবির হোসেন;
১৪. স্বপন, পিতা: মোনসের;
১৫. শাহানা বেগম, পিতা: মাহতাব উদ্দীন;
১৬. আমেনা বেগম, পিতা: রাজীব
১৭. মিনা খাতুন, পিতা: আব্দুর রশীদ;
১৮. ফাতেমা আক্তার, পিতা: সুজন
১৯. মাহবুব (সেকশন ম্যানেজার), পিতা: গকুল;
২০. রিপন মিয়া, পিতা: সেলিম মিয়া;
২১. নোমান মিয়া, পিতা: মান্নান মিয়া;
২২. নাজমা বেগম, পিতা: আফজাল হোসেন;
২৩. মোহাম্মদ আলী, পিতা: শাহাদৎ খান;
২৪. মোঃ হাসনাইন, পিতা: ফজলু;
২৫. জিহাদ রানা, পিতা: মো: শওকত;
২৬. সেলিনা বেগম, পিতা: মো: সেলিম;
২৭. রিমা আক্তার, পিতা: জসিম উদ্দীন;
২৮. মো: রাকিব, পিতা: কবির;
২৯. ফারজানা আক্তার, পিতা: সুরুজ আলী;
৩০. নাজমুল, পিতা: চান মিয়া;
৩১. তাছলিমা, পিতা: বাচ্চু মিয়া;
৩২. মো: আকাশ, পিতা: বাহার;
৩৩. রাশেদ, পিতা: আবুল কাশেম;
৩৪. বাদশা, পিতা: এনায়েত;
৩৫. ইউসূফ, পিতা: (অনুসন্ধান চলছে)
৩৬. জিহাদ, পিতা: আবুল বাসার;
৩৭. শাকিল, পিতা: (অনুসন্ধান চলছে)
৩৮. জাহানারা বেগম, পিতা: খোকন
৩৯. তাছলিমা (২), পিতা: বাচ্চু মিয়া;
৪০. রহিমা আক্তার, পিতা: আজিজুল হক;

৪১. নুসরাত জাহান টুকটুকি, পিতা: হাসানুজ্জামান সরকার;
৪২. রাবেয়া বেগম, পিতা: মালেক;
৪৩. মাহমুদা বেগম, পিতা: মালেক
৪৪. তাকিয়া আক্তার, পিতা: আজমত আলী;
৪৫. ইসরাত জাহান তুলি, পিতা: আব্দুল মান্নান;
৪৬. শাহানা বেগম, পিতা: নিজাম উদ্দীন;
৪৭. সাজ্জাদ হোসেন সজীব, পিতা: ফয়জুল ইসলাম
৪৮. লাবনী আক্তার, পিতা: লালসু মিয়া
৪৯. স্বপ্না রাণী, পিতা: জতি বিশ্বাস
৫০. মিনা আক্তার, পিতা: হারুণ মিয়া;
৫১. মোরসালিন, পিতা: আনিসুর রহমান

[তথ্যসুত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন এবং রূপগঞ্জ থানার মামলা নং ১৯ (১০-০৭-২১)

সেজান জুস কারখানায় দুর্ঘটনার বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক সৌমেন বড়ুয়ার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, সজীব গ্রুপের হাসেম ফুডস কারখানাটি ২০০০ সালে কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে অনুমোদন নেয়া। এই কারখানাটি নিবন্ধনের ডকুমেন্টস অনুযায়ী এতে ১ হাজার ৬০০ শ্রমিকের কাজ করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান, তিনি দায়িত্বে আসার পর গত ২ বছরে কভিডকালীন স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না– এ বিষয়ে একাধিক বার এ কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সেইফটি এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে পরিদর্শন করা হয়নি। কারখানাটিতে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের বিষয়ে এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান, শ্রমআইন অনুযায়ী ১৪-১৮ বছর বয়স অনুযায়ী কিশোররা লাইট (হালকা) কাজের জন্য নিয়োজিত হতে পারে। সেই অনুযায়ী ওই কারখানা পরিদর্শনে গিয়ে ১৪ বছরের নিচে অর্থাৎ কোন শিশু সেখানে কাজ করতো– এমনটা ইন্সপেকশনে দেখা যায়নি। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস টিমের তথ্যানুসন্ধানকালে দেখা যায়, ১২/১৩ বছর বয়সী কিছু শিশু শ্রমিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত হয়েছে– এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, এমনটা হতে পারে। অনেক সময় আমরা ইন্সপেকশনে গেলে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে (শিশু শ্রমিক) লুকিয়ে রাখে বা কারখানা থেকে বের করে দেয়। কারখানাটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে সৌমেন বড়ুয়া জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর যুগ্ম মহাপরিদর্শক ফরিদ আহমেদকে প্রধান করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত টীম গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ৩ জন (শনাক্তকৃত) শ্রমিকের প্রত্যেকের পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিকদের মধ্যে ১৭ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। অপর এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানান, হাসেম ফুডস কারাখানার নামে বীমা থাকলেও শ্রমিকদের নামে কোন গ্রুপ বীমা ছিল না। কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখার যুগ্ম-মহাপরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই দুর্ঘটনায় মোট ২৯ জন শ্রমিক আহত হওয়ার তথ্য তারা পেয়েছেন তার মধ্যে বেশির ভাগ চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। আহত শ্রমিকের সকল চিকিৎসা খরচ কল্যাণ তহবিল থেকে বহন করা হয়েছে। আহত প্রত্যেক শ্রমিককে কল্যাণ তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অর্থপেডিক ওয়ার্ডের কেভিন ১ এ এখনও (১৮ জুলাই ২০২১ তারিখ পর্যন্ত) তিনজন শ্রমিক ভর্তি আছে। হাসেম ফুড কারখানায় দুর্ঘটনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর পক্ষ থেকে যে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে তার প্রধান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সেইফটি) প্রকৌশলী ফরিদ আহম্মেদ বলেন, দুর্ঘটনার পর আমি সেখানে নিজে পরিদর্শন করেছি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কারখানার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে কথা বলেছি। আমার ডিপার্টমেন্ট এর একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে তদন্ত করানো হয়েছে। তারা তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাদের রিপোর্ট এনালাইসিস করে রিপোর্ট করা হবে। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে ভবনের দুটি সিঁড়ির মধ্যবর্তি দূরত্ব সঠিক হলেও সিঁড়ির ল্যান্ডিং বর্হিমুখি থাকার কথা– কিন্তু সেটা অর্ন্তমুখি ছিল। অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা অপ্রতুল, নিচতলায় সিঁড়ির পাশে থাকা একমাত্র ফায়ার হাইড্রিলটির সাথে পানির কোন সংযোগ ছিল না। তিনি বলেন যখন আগুনের সূত্রপাত হয় তখন সেই বিভাগে কোন লোক ছিল না। বাহিরের সিকিউরিটি গার্ড যখন আগুন দেখতে পায় তখন পুরো নিচতলা ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তারা প্রথমে অন্য ভবন থেকে নিয়ে আসা ফায়ার এক্সটিংগুইসার দিয়ে আগুন থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু ধোঁয়ার কারণে আগুন থামাতে ব্যর্থ হয়।

[সৌজন্যে: 'শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামে'র তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন]

সেজান জুস কারখানায় দুর্ঘটনার পর জাতীয় পর্যায়ে লেখক, আইনজীবী ও শ্রমিক সংগঠকদের সমন্বয়ে একটা নাগরিক তদন্তদল ঘটনার তদন্ত ও পর্যালোচনা শেষে নীচের ১০টি সুপারিশ তুলে ধরে

১. বিভিন্ন বিবেচনায় দেখা যায়, কারখানাটি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। এই শিল্প গ্রুপের অধীনে আরও ১০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কাজেই কোনো যুক্তিতে কারখানায় ন্যূনতম নিরাপত্তা না থাকা, নিম্নমজুরি, অনিরাপদ কর্মপরিবেশ তাদের অক্ষমতার ফলাফল নয়; বরং অনিচ্ছা, অবহেলা, জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে মুনাফা বৃদ্ধির তাড়না থেকে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। সেজন্য এটিকে আমরা 'দুর্ঘটনা' না বলে 'কাঠামোগত হত্যা' বলে চিহ্নিত করছি এবং সেভাবেই দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক বলে মনে করছি। কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা এবং শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করার কারণে যে দুর্ঘটনা ঘটছে তা কার্যত হত্যাকান্ড।

২. কারখানা ভবনের নকশা অনুমোদন, অগ্নিনির্বাপণ ও শ্রম আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেনি বলে দায়িত্ব অবহেলাকারী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৩. বিদ্যমান আইনের বহুরকম দুর্বলতা ও ঘাটতির অন্যতম দৃষ্টান্ত ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইন। আমরা মনে করি, কর্মস্থলে একজন শ্রমিক যদি নিহত হন তাহলে ক্ষতিপূরণ এমন হতে হবে যা তার বেঁচে থাকলে সারাজীবনের সম্ভাব্য আয়ের বেশি হয় এবং যা কর্তৃপক্ষের জন্য আর্থিক শাস্তিস্বরূপ হয়। শ্রম আইনের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নিহত, আহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবার প্রতি যথাপোযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। আহতদের পূর্ণসুস্থতা পর্যন্ত সমস্ত চিকিৎসা ব্যয় দেয়া, চিকিৎসাকালকে সবেতন ছুটি হিসেবে গণ্য করা এবং যথাপোযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত কারখানায় চাকরি করতেন এমন সকল শ্রমিকের বিকল্প কর্মসংস্থান ও কাজ হারানোর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে লোকবল বাড়াতে হবে। পরিদর্শকের সংখ্যা ও দক্ষতা বাড়ানো এবং যেখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটছে, সেখানে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার মতো সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন। অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার সার্ভিস এর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে।

৫. সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্নি নির্বাপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখার পাশাপাশি সকল শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. কর্মস্থল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লে বা সেখানে আইনানুগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে, শ্রমিকেরা যেন পরিদর্শন অধিদপ্তরকে যেকোনো সময় অবহিত করতে পারে এবং পরিদর্শন অধিদপ্তর যেন খবর পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্মস্থলে হাজির হয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে, সেজন্য আইনি বিধান রাখা জরুরি।

৭. শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা এবং অবাধে ইউনিয়ন করার সুযোগ নিশ্চিত করতে সংগঠকদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা (পেশাগত, আইনি ও সামাজিক) প্রদান করতে হবে।

৮. কর্মস্থলে চিকিৎসা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিজ খরচে ও দায়িত্বে চিকিৎসা করতে হবে।

৯. শিশুশ্রম নিরসনে প্রধানত দরকার শিশুদের অভিভাবকদের আয় বৃদ্ধি করা। সেজন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এমন পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে, যা দিয়ে তারা শিশুর শিক্ষার পুরো ব্যয় এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি আংশিক হলেও নিশ্চিত করতে পারে।

১০. সমগ্র শিল্পখাতে তালিকাভুক্ত ও তালিকাবহির্ভূত কারখানাসমূহের ভবন নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ ও শ্রমিক অধিকার, বিদ্যমান আইনের ঘাটতি ও আইন প্রয়োগের দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ সরকারের পক্ষ থেকে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। বর্তমান বিপজ্জনক, প্রাণঘাতী পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য করণীয় নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্নপক্ষের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করতে হবে।

বাঁশখালী বিদ্যুতকেন্দ্রে আবারও শ্রমজীবীর মৃত্যু

একটি বিদ্যুতকেন্দ্র গড়তে এ পর্যন্ত ১১ জন মানুষের প্রাণ গেল; মানবাধিকার কর্মীরা চিঠি দিলেন চীনের রাষ্ট্রদূতকে

২০২১ সালে শ্রমিক অঙ্গনের সবচেয়ে আলোচিত একটা অধ্যায় ছিল বাঁশখালী বিদ্যুতকেন্দ্রে গুলির ঘটনা। ১৭ এপ্রিল ঘটনার শুরু হলেও পরের কয়েক মাস জুড়ে এর প্রতিক্রিয়া চলছিল। চট্টগ্রামের এই এলাকায় ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণের একটা যৌথপ্রকল্প পরিচালনা করছে বাংলাদেশের এস আলম গ্রুপ এবং চীনের দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে। ২০২১ সালের এপ্রিলের শ্রমিক বিক্ষোভ ও তাতে মৃত্যুর আগেও ঐ একই বিদ্যুতকেন্দ্রে জমি সংক্রান্ত অসন্তোষ এবং গুলিতে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল।

২০২১-এর ১৭ এপ্রিল বেতন ভাতা ও অন্যান্য কিছু সুবিধার দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে তাতে গুলির ঘটনায় প্রথমে চার জন মারা যায়। এরা হলেন রেজা, রনি, শুভ ও রাহাত। পরে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে হাবিবুল্লাহ নামে আরেকজন মারা যায়। তারপর আরও দুই আহত শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এভাবে সর্বশেষ এই ঘটনায় সাত শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত অনেকে এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। সংবাদ মাধ্যমসূত্রে দেখা যায়, মৃতদের পরিবারের দাবি– তাদের স্বজনরা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। নিহতদের মতোই আহতরা মূলত গুলিবিদ্ধ ছিল।

এ বিষয়ে বাঁশখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইদুজ্জামান চৌধুরী প্রচারমাধ্যমকে তখন বলেন, 'শ্রমিকদের বেশকিছু দাবি-দাওয়া ছিল। সেটা তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাচ্ছিল। শনিবার সকালে অসন্তোষ বাড়তে থাকে এবং পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে স্থানীয় লোকজনও জড়িয়ে পড়ে।' (ডয়েস ভেলে, ১৭ জুলাই ২০২১)।

বাঁশখালীর পুলিশ কর্মকর্তা আজিজুল ইসলাম বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, প্রায় দুই হাজার শ্রমিক পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছুঁড়তে থাকে। এ সময় পুলিশ পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) আনোয়ার হোসেন মানবজমিন পত্রিকার সংবাদদাতাকে বলেন (১৮ জুলাই), 'বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকালও গন্ডামারা ইউনিয়ন এলাকায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। এ বিষয়ে বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা বিক্ষোভের এক পর্যায়ে হামলা চালায়। শ্রমিকরা পুলিশের ওপর হামলা চালালে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে ৫ শ্রমিক নিহত হয়েছে। তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভেতরে প্রায় ৫০ জন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছে।'

সামগ্রিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, মূলত মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ, পবিত্র রমজানে কর্মঘন্টা কমানো এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির দাবিতে এই শ্রম অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম। শ্রমিকদের সাধারণ কিছু দাবি ছিলো। ঘটনার পরপর গন্ডামারা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রাশেদুজ্জামান বেগ বাদি হয়ে একটা মামলা করেছেন– যাতে নাম পরিচয় ছাড়াই কয়েক শ জনকে আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি গাড়ি পোড়ানোসহ ক্ষয়ক্ষতির একটা মামলা করেছেন এসএস পাওয়ার প্ল্যান্টের কর্মকর্তা ফারুক আহমেদ বাদি হয়ে। তাতে ২২ জনের নাম এবং আরও প্রায় দেড় হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ডেইলি স্টারের ২০২১ সালের ১৭ এপ্রিলের প্রতিবেদনে দেখা যায়, তাদের প্রতিনিধি যখন একজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের কী কী দাবি ছিল? তখন তার জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের দাবি ছিল ১০টা। যেমন, বাথরুম ঠিক নাই, পানির সমস্যা, রোজার মাসে ডিউটির

সময় কমিয়ে দেওয়া, ইফতারি ও নামাজের জন্য সময় দেওয়া। আরেকটা দাবি ছিল দুই ঈদে বোনাস দেওয়া।'

উল্লেখ্য, এর আগে একই বিদ্যুতকেন্দ্রে জমি সংক্রান্ত অসন্তোষে তিন ব্যক্তি মারা যায় ২০১৬ সালের এপ্রিলে। তারা ছিলেন মর্তুজা আলী, আনোয়ার হোসেন আংকুর এবং জাকির আহমেদ। পরে আরেকজন মারা যায় মো. জাকের। এছাড়া ঘটনায় তখন ১৯ জন আহত হয়। পুলিশ তখনও দাবি করে তারা আত্মরক্ষার্থে গুলি করেছে এবং তাদেরও কয়েকজন আহত হয়েছে। ঐ সময় বাঁশখালী থানার ওসি ছিলেন স্বপন কুমার মজুমদার এবং সাতকানিয়া সার্কেলের এএসপি ছিলেন একেএম এমরান ভুইয়া।

এলাকার সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান তখন মৃত্যুর ঘটনায় জনৈক লিয়াকত আলীকে দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেন, 'সরকারের উন্নয়ন কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে' এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, উল্লিখিত লিয়াকত আলী হলেন স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠো 'বসতভিটা ও গোরস্তান রক্ষা কমিটি'র আহ্বায়ক। ২০১৮ সালে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিটির সদস্যদের বক্তব্য হলো তারা প্রথমে ভেবেছিলেন এখানে কারাখানা হবে এবং এলাকার বেকাররা কাজ পাবে। কিন্তু পরে দেখতে পান বিদ্যুতকেন্দ্র হচ্ছে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী লবণ ও চিংড়ি আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এলাকার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই তারা প্রতিবাদ করছেন।

স্থানীয় মানুষদের একাংশ, যাদের জমিতে বিদ্যুতকেন্দ্র হচ্ছে তাদের দাবি হলো জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায়ও তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। সেই ক্ষতির কথাই তারা বলতে গিয়েছিল। এই কেন্দ্র স্থাপনের ফলে স্থানীয় চিংড়ি ঘের ও লবণ চাষের ক্ষতির কারনেই মূলত স্থানীয় সমাজে

বাঁশখালী বিদ্যুতকেন্দ্রে এপর্যন্ত নিহত শ্রমিক ও গ্রামবাসীর তালিকা

২০২১	২০১৬
শুভ	মর্তুজা আলী
মো. রাহাত	আনোয়ার হোসেন
আহমেদ রেজা	জাকির আহমেদ
রনি হোসেন	মো. জাকের
হাবিবুল্লাহ	
শিমুল আহমেদ	
রাজেউল ইসলাম	

অসন্তোষ ছিল। প্রথম গুলির ঘটনার একদিন পর তারা সমাবেশ করেও এই বিদ্যুতকেন্দ্র বাতিল চেয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে দাবি রয়েছে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়ার।

২০১৬ সালের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর প্রচারমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে সেখানে ইতোমধ্যে ৬২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গুলির ঘটনার পরপরই উপজেলায় প্রতিবাদী হরতাল পালিত হয় একদিন পর এবং বিক্ষোভ মিছিল হয়। বিক্ষোভকারীরা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্রের ফলে এলাকায় পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে বলেও আশঙ্কার কথা বলছিলেন। এলাকার জেলে সমাজ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে ঐতিহ্যবাহী পেশা হারানোর ঝুঁকির কথাও জানিয়েছেন।

ঘঁনার তদন্তে একটি কমিটি করা হয়েছে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন অতিরিক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোমিনুর রশিদের নেতৃত্বে। কমিটির অন্য দুই সদস্য ছিলেন জেলার অতিরিক্ত সরকারি কৌসুলী মনোরঞ্জন দাশ এবং জেলার সহকারী পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারাও একটা তদন্ত কমিটি করেছে। এই কমিটির প্রধান করা হয় চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) মো. হাবিবুর রহমানকে। বাকি দুই সদস্য হলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা) মুহাম্মদ আবদুল আওয়াল ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক ফারুক আহমেদ।

তবে ঘটনার ৫ দিন পর ২০১৬ সালের ৯ এপ্রিল প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় তখনও তদন্ত কাজ শুরু হয়নি। এই বিলম্বের কারণ হিসেবে জেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটির তরফ থেকে 'এলাকার প্রতিকূল পরিবেশ'কে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কমিটি প্রথম আলোকে বলেছে, 'সাদা পোশাকে পুলিশ এলাকায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছে।' এ বিষয়ে প্রচার মাধ্যমসূত্রে আর কিছু জানা যায়নি।

এছাড়া ঘটনার পরপরই তিনটি মামলা হয়। দুটি মামলা করেন নিহতদের পরিবার। এর একটি করেন নিহত মরতুজা ও আংকুরের ভাই মৌলভী বশির এবং অপর মামলাটি করেন আরেক স্বজন মনোয়ারা বেগম।

আর 'সরকারি কাজে বাধা দেয়া'র অভিযোগ এনে অপর একটি মামলা করে পুলিশ। পুলিশের মামলার বাদী স্থানীয় থানার এসআই বাহার মিয়া। এই মামলায় ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করে 'অজ্ঞাত পরিচয়' তিন হাজার দুই জনকে আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই মামলার পরপরই এলাকা পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। গ্রেফতারের ভয়ে এলাকার পুরুষরা বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। তবে এর মাঝেও

বাঁশখালীতে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের বিক্ষোভ

কয়েকজন গ্রেফতার হন তখন। গ্রেফতারকৃতরা প্রচারমাধ্যমকে তখন বলছিলেন, 'আহত হয়ে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার পর তাদের আটক করা হয়।'

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিক এসব অসন্তোষ ও মৃত্যুর মাঝেই বাঁশখালী বিদ্যুতকেন্দ্র কেন্দ্রীক ঘটনাবলীতে নানান রূপে মানুষের আটক অব্যাহত ছিল। যার সর্বশেষ নজির হিসেবে দেখা যায় ২০২১ সালের ২৮ মে ফেসবুকে এই বিদ্যুতকেন্দ্র নিয়ে পোস্ট দেয়ায় জনৈক প্রকৌশলী মো. শাহনেওয়াজ চৌধুরীকে গ্রেফারের ঘটনা। এছাড়া প্রথম আলোর ৪ মে'র এক প্রতিবেদনে মো. জাফর ও সৈয়দ নুর নামে স্থানীয় গন্ডামারা এলাকার দুই বাসিন্দার গ্রেফতারের ঘটনাও জানা যায়। গন্ডামারা বিদ্যুত কেন্দ্রের পাশের গ্রাম। এই দুই জনকে আটক করা হয় ২০২১-এর ১৭ এপ্রিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

প্রকৌশলী মো. শাহনেওয়াজ চৌধুরীর পরিবার থেকে বলা হয়েছে, তিনি ইতোপূর্বে নিহত আহমেদ রেজা মীরের আপন চাচা। বাঁশখালী কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের চীফ কোঅর্ডিনেটর ফারুক আহমদ বৃহস্পতিবার (২৭ মে ২০২১) বিকাল ৫ টায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তাঁর বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। এরই ভিত্তিতে পুলিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫, ২৯ ও ৩১ ধারায় মামলা রুজু করে এবং তাকে ওইদিনই রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। বাঁশখালী বিদ্যুতকেন্দ্র নিয়ে ফেসবুকে দেয়া তাঁর বক্তব্যকে এই মামলার বিষয়বস্তু করা হয়।

এদিকে সর্বশেষ শ্রমিক অসন্তোষ এবং প্রাণহানির পর হাইকোর্ট ২০২১ সালের ঘটনায় নিহতদের পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেয় ৪ মে। পৃথক দুটি রিটের শুনানিতে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এবং বিচারপতি সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রুল দেয়। রুলে ১৭ এপ্রিলের ওই সংঘর্ষে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৭ শ্রমিক নিহত এবং প্রায় ৩০ জন আহত হওয়ার ঘটনায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে এবং হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের পরবর্তী নিরাপত্তা সুরক্ষা নিশ্চিতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা-ব্যর্থতা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

চীনের রাষ্ট্রদূতকে চিঠি

শ্রমিক নিহত হওয়ার পর দেশের কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী এবং শিক্ষাবিদ ঘটনায় প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ চেয়ে চীনের রাষ্ট্রদূতকে এক চিঠি লিখেন ২৯ এপ্রিল। সেখানে হত্যাকান্ড ও সহিংসতায় চীনা দূতাবাসের

নীরবতার প্রতিবাদ জানিয়ে চারটি দাবি জানান তাঁরা। দাবিসমূহ হলো, হতাহত শ্রমিকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; শ্রমিকদের হত্যা, জখম ও হয়রানির ঘটনায় দায়ী চীনা কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তাদের চীনের আইন অনুযায়ী বিচার করা; আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং এই প্রকল্পে জড়িত কোম্পানিগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনতে যৌথ উদ্যোগের চুক্তি প্রকাশ করা।

পুনশ্চ

তদন্ত প্রতিবেদন যা বলছে

২০২১ সালে বাঁশখালীর গুলিবর্ষণের ঘটনার দীর্ঘ এক মাস পর দৈনিক সমকালে ২২ মে পুলিশী তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন বিষয়ে কিছু খবর প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়: শ্রমিকদের সময়মতো বেতন না দেওয়া, অস্বাস্থ্যকর আবাসন ব্যবস্থাসহ বেশ কিছু কারণ ছিল এই ঘটনার পেছনে। সমকালের ভাষ্য অনুযায়ী চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আনোয়ার হোসেনের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন তদন্ত কমিটির প্রধান চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি জাকির হোসেন খান। প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়েছিল শ্রমিকরা। বেতন পেতে কোনো কোনো মাসে ১৮ তারিখ পর্যন্ত শ্রমিকদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। এর জন্য দায়ী শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। রমজান মাসকে কেন্দ্র করে কিছু সমস্যাও শ্রমিকদের বিক্ষোভের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর আবাসন, সুপেয় পানি সংকট, অপরিষ্কার টয়লেট ও খাবার সমস্যা ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। শ্রমিকদের এ বিক্ষোভ পরিকল্পিতও মনে হয়নি তদন্ত কমিটির।

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধান

মহামারিতে বেকার ২৬ লাখের বেশি মানুষ

২০২১ সালের ৪ জুলাই দৈনিক বণিক বার্তায় বদরুল আলমের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় মহামারিতে কর্মসংস্থানের অবস্থা জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক এক অনুসন্ধান চালায়। তাতে এই সংস্থা দেখতে পেয়েছে দেশে প্রায় ২৬ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছে

দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে মহামারির অভিঘাত। কর্মসংস্থান হারিয়েছে বিপুল মানুষ। বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯ সদস্যের এক অনুসন্ধানী দল জানিয়েছে, মহামারীর কারণে দেশে ২০২০-এ কর্মসংস্থান হারিয়েছে ২৬ লাখের বেশি মানুষ। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০২১-এর জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে এ তথ্য জানায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপের পরিসংখ্যানকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই রিপোর্ট দেয়।

উল্লেখ্য, দেশে শ্রমশক্তির আকার এখন প্রায় ৬ কোটি ৪০ লাখ। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধান বলছে মহামারির কারণে গত ২০২০-এ বেকার হয়ে পড়েছে ঐ শ্রমশক্তির ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। সে হিসাবে দেশে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ১৪ হাজার ৪০০ জন।

ব্যাংকের অনুসন্ধানে কোভিডের প্রভাবে সবচেয়ে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় শিল্পখাতে। এ খাতে কর্মচ্যুতির হার ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। পাশাপাশি সেবা খাতে নিয়োজিতদের মধ্যে বেকার হয়েছে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। খারাপ প্রতিক্রিয়া তুলনামূলক কম কৃষি খাতে। সেখানে কর্মসংস্থান হারিয়েছে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষকরা এও জানিয়েছে, আনুমানিক হিসাবে মহামারির প্রথম বছরে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি থেকে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ কর্মসংস্থান কমে গেছে।

আলোচ্য এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে শ্রমঘণ্টা বিষয়ে একাধিক বৈশ্বিকসূচক বিবেচনায় নেয়া হয়। কোন খাত কী পরিমাণ মজুরি হারিয়েছে সে বিষয়গুলোও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। বিবেচনায় নেয়া হয়েছে কভিড-পূর্ববর্তী সময়কালও।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ গবেষণা তথ্য একই বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০২০-এর সমীক্ষার তথ্য তুলে ধরে তারা বলছেন, কোভিডকালে গত বছর কর্মঘণ্টা হারিয়েছে ১২ দশমিক ২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গবেষণায় এ হার দেখানো হয়েছে ১৩ শতাংশ।

এই গবেষণার একটা ইতিবাচক দিক হলো, এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে মহামারি থেকে মানুষ বাঁচাতে সহায়তার কাজে পরিকল্পনা করা সহজ হবে বলে ধারণা করা যায়। কর্মসংস্থান হারানোর হিসাবে কোন খাত কতটা অগ্রাধিকার পেতে পারে তার দিকনির্দেশনা এই গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। বছর শেষে মোট দেশজ উৎপাদনের হিসাব (জিডিপি) করার কাজেও এটি কাজে লাগানো যেতে পারে।

বণিক বার্তার আলোচ্য প্রতিবেদনে উপরোক্ত গবেষণা সম্পর্কে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি)-এর মতামত যুক্ত করা হয়। সেখানে এই সংস্থার ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, করোনার প্রথম ধাক্কায় মোট শ্রমশক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক খাত ছাড়া অন্যত্র প্রায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত মানুষ বেকার হয়ে গিয়েছিল। পরে অনেকে আবার কাজে ফিরেছেন। তবে এক খাত থেকে অন্য খাতে সরে যাওয়ায় আয় কমেছে। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দ্রুত স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে হবে। এরপর অগ্রাধিকার দিতে হবে প্রণোদনা প্যাকেজে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারিদের জন্য যেগুলো সেগুলো প্রথম প্যাকেজ শেষ করার পর নতুন প্যাকেজ দিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষার যেসব কর্মসূচি আছে সেগুলোর মাধ্যমে নগদ সহায়তা পৌনঃপুনিক করা এবং ভিত্তি বাড়ানোর দরকার আছে। এর মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টি হবে। এতে সরবরাহ ব্যবস্থাও সক্রিয় হবে। কর্মসংস্থানও হবে। এভাবে অর্থনীতিতে ইতিবাচক চক্র সৃষ্টি করা সম্ভব।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি কামরান টি রহমান ২০২১-এর ৪ জুলাই উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে বণিক বার্তাকে জানিয়েছেন, এ বছর দেশের বেশির ভাগ জেলাই কভিডের ঝুঁকিতে পড়ে যাওয়ায় দেশ আবার নতুন করে কর্মসংস্থানে পিছিয়ে পড়তে থাকে। টিকা কর্মসূচিই কেবল এ পরিস্থিতি থেকে দেশকে বের করে আনতে পারে। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নির্ভর করছে চাহিদা সৃষ্টির ওপর। লকডাউন থাকলে চাহিদা কমবে, অর্থনীতিকে সক্রিয় করতে আবারো কিছুটা সময় লাগবে। চাহিদা লকডাউনে সৃষ্টি হবে না। আবার লকডাউন থাকবে না যখন পরিস্থিতি উন্নত হবে। সেটা হবে যখন টিকা প্রদান কর্মসূচি সম্পন্ন হবে। সুতরাং শেষ বিচারে প্রতিষেধক টিকাই অর্থনৈতিক আস্থা ফেরাতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রক্ষেপণ প্রতিবেদন বলেছিল, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থান হারাবে ১১ লাখ তরুণ-তরুণী। দীর্ঘমেয়াদে এ সংখ্যা ১৬ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। 'ট্যাকলিং দ্য কোভিড-১৯ ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট ক্রাইসিস ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রতিবেদনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৬৬ কোটি তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা দূর করতে জরুরি ভিত্তিতে বড় আকারের লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ জানিয়েছিল তখন এডিবি-আইএলও।

এদিকে ২০২১-এর জানুয়ারিতে ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) দেশের তরুণ তরুণীদের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখতে পায়, মহামারির আগে চাকুরিতে নিযুক্ত থাকলেও এই তরুণ-তরুণীদের ১৫ শতাংশ মহামারির পর কর্মহীন হয়ে পড়ে। আবার যারা কাজ হারানোর পর আবার কাজ যোগাড় করতে পেরেছে তাদের গড় আয় কোভিড-পূর্ব অবস্থার তুলনায় ১১ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। ২০২১-এর ২২ জুন দৈনিক কালের কণ্ঠে এই বিষয়ে যে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখা যায়, তার তথ্য অনুযায়ী, আয় কমার ক্ষেত্রে গ্রামের তরুণদের চেয়ে শহুরে তরুণদের আয় বেশি কমেছে। মহামারির আগে চাকুরিরত তরুণীদের এক তৃতীয়াংশ ২০২১ সালের জানুয়ারিতে তাদের চাকুরি হারায়। চাকুরি হারানোর এই হার তরুণদের চেয়ে তিন গুণ বেশি। জরিপের আওতাধীন তরুণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছে গৃহশিক্ষক ও হস্তশিল্পে নিয়োজিতরা।

অন্যদিকে, দেশের উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্ব কীরূপ ভয়াবহ আকার নিয়েছে তার সাক্ষ্য হয়ে আছে দেশের বিসিএস পরীক্ষাসমূহ। সাম্প্রতিক অধিকাংশ বিসিএসে প্রতি পদের বিপরীতে দুই শ'য়ের বেশি আবেদনকারী আবেদন করেছে। ৪৩তম বিসিএসে পদ প্রতি আবেদনকারী ছিলেন ২৪৪ জন। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা শেষে ২৪৩ জনকেই নতুন করে চাকুরি খুঁজতে হবে। চাকুরির আবেদনও দেশে ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।

চাল ও তেলের দাম হয়ে উঠেছে শ্রমিক জীবনের দীর্ঘশ্বাস

মহামারির পাশাপাশি, ২০২১ সালে দ্রব্যমূল্য– বিশেষ করে চালের দাম বেশ ভুগিয়েছে বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের। বোরো ও আমন– ধানের উভয় মওসুমে ভালো ফলন হলেও চালের বাজার ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী ছিল এবং এখনও তাই আছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিত বাজার দরের যে হালনাগাদ তথ্য দেয় তাতে ২০২১-এর ৯ আগস্ট দেখা যায় মোটা সিদ্ধ চাল কেজি প্রতি ৪৮ থেকে ৫০ টাকা এবং আটা কেজিপ্রতি ২৮ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এরকম তথ্য প্রকাশের কাছাকাছি সময়ে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) দৈনিক যুগান্তরকে (৪ আগস্ট) জানিয়েছিল, সরকারি নজরদারির দুর্বলতায় খুচরা বাজারে সাধারণ 'ভোক্তারা চালে কেজিপ্রতি ১০-১১ টাকা বেশি দিচ্ছেন।' ক্যাবের সভাপতি গোলাম রহমানের মতে, যেহেতু সরকারি হিসাবে চালের কেজিপ্রতি উৎপাদন খরচ ৩৯ টাকা– সুতরাং এর খুচরা মূল্য ৪৫-৪৬ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়।

এমনকি ২০০০ সালেও মোটা চাল বিক্রি হয়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা কম দামে। ২০২১ সালের ১৭ জুলাই দৈনিক সমকাল ঢাকায় এক অনুসন্ধান শেষে পর দিন লেখে: 'গতকাল শনিবার রাজধানীর মিরপুর-১, মোহাম্মদপুর টাউন হল, আগারগাঁও ও কারওয়ান বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরায় প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৪৮ থেকে ৫০ টাকা। গত বছর বোরো মৌসুমে এ চাল ৪০ থেকে ৪৪ টাকা ছিল। এক বছরের ব্যবধানে একই সময়ে কেজিতে ৬ থেকে ৮ টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে মোটা চালের ভোক্তাদের। যারা অধিকাংশই শ্রমজীবী পরিবার।

শুধু মোটা চাল নয়, মাঝারি ও সরু চালের দামও বেড়েছে গত বছর। ২০২১ সালের জুলাইয়ে সরু চালের মধ্যে মিনিকেট ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা; আর নাজিরশাইল ৬৮ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আগে এই চালের দাম ছিল যথাক্রমে মিনিকেট ৫৬ থেকে ৬০ টাকা এবং নাজিরশাইল ৬২ থেকে ৬৫ টাকা। করোনার মাঝেই এই দামবৃদ্ধি– যখন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মজীবী-শ্রমজীবীরই আয় বাড়েনি– কমেছে কেবল।

দৈনিক সমকালের উপরোক্ত প্রতিবেদনে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য উদ্ধৃত করে এও বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ের চেয়ে সরু ও মাঝারি চাল ১২ শতাংশ ও মোটা চাল ১৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে ২০২১ সালে।

এভাবে উৎপাদন খরচ ও বাজার পর্যায়ে বিক্রয় দামের ফারাকের মাধ্যমে কেবল বোরো মওসুমের চাল থেকে বাজার অদৃশ্য এক সিন্ডিকেট প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা লাভ করে নেয় বলে যুগান্তরের ৪ আগস্টের প্রতিবেদনে হিসাব দেয়া হয়েছে। এই বাড়তি মুনাফার বড় অংশই যায় মোটা চালের বড় ভোক্তা শ্রমজীবী মানুষের পকেট থেকে। অথচ এ বছর বড় বড় শিল্পখাতগুলোতে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক কোন ঘটনা ঘটেনি।

যুগান্তরের দেয়া তথ্য মতে, ২০২০-২১ অর্থ বছরে বোরো মৌসুমে চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০৫০ কোটি কেজি। কেজিপ্রতি ৫ টাকা বাড়তি লাভ করা হলে এই চাল থেকে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি মুনাফা করা যায়। যদিও কেবল ৫ টাকা নয়– চালের উৎপাদন ও বিক্রি পর্যায়ে ব্যবধান দেখা যাচ্ছে ১০ টাকা পর্যন্তও। গত বছর মোটা সিদ্ধ চালের দাম প্রায় কোন সময়ই ৫০ টাকার নীচে ছিল না।

উল্লেখ্য, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এক একর জমিতে ধান আবাদে খরচের নিম্নোক্ত হিসাবে চালের উৎপাদন খরচ সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা প্রচার করে। অধিদপ্তরের হিসাবে দেখা গেছে– এক একরে কৃষকের বীজ খরচ ৮০০ টাকা, সার বাবদ ৫ হাজার ৬৮৫ টাকা, চারা পর্যায়ে মাড়াই খরচ ৭০০, রোপায় যায় ৫০০, আগাছা নিড়ানিতে ৭০০ টাকা। এই হিসাবে একর প্রতি কৃষকদের পারিবারিক শ্রম ধরা হয়েছে ১১ হাজার এবং ভাড়ায় আনা শ্রমিকের মজুরি ধরা

হয়েছে ২৬ হাজার টাকা, জমি কর্ষণের খরচ ধরা হয়েছে সাড়ে ৪ হাজার টাকা, পানির জন্য ৮ হাজার এবং ধান মাড়াই খরচ ধরা হয়েছে ৩ হাজার টাকা। পাশাপাশি এক একর জমিতে কৃষকের চলতি মূলধন লাগে গড়ে ৪৯ হাজার ৮৮৫ টাকা– যার সুদ ধরা হয়েছে ৭৪৮ টাকা এবং জমির ভাড়া খরচ হিসেবে ধরা হয়েছে ৮ হাজার টাকা। এভাবে সব মিলে খরচ দাঁড়ায় আনুমানিক ৬৯ হাজার ৬৩৩ টাকা। প্রতি একর জমিতে কৃষকরা ধান পায় গড়ে ২৫ 'শ কেজি। খড় বিক্রি করতে পারে ৪ হাজার ৬০০ টাকা। খড়ের আয় বাদ দিলে ধানের কেজিপ্রতি উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ২৭ টাকা এবং ধান থেকে চালের উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় কেজি প্রতি ৩৯ টাকা। পাইকারি বাজারে এই চাল ৪৫ টাকার উপরে বিক্রি হয় এবং খুচরা বাজারের ৫০ টাকা বা তদুর্ধ্ব দামে বিক্রি হয়। অর্থাৎ পাইকারি ও খুচরা বাজার পর্যায়ে চাল থেকে কেজি প্রতি প্রায় ১০ টাকা মুনাফা তুলে নেয়া হয়। এই মুনাফা কৃষক পায় না এবং এই মুনাফার মূল ক্ষতির শিকার গ্রাম-শহরের মোটাচালের ভোক্তাসমাজ।

বলাবাহুল্য, দেশে উৎপাদিত চালের সবটাই মোটা চাল নয়। তবে বাজার বাস্তবতা থেকে দেখা যায়– মোটা চালের চেয়ে চিকন চালে মুনাফার আয়তন আরও অনেক বেশি।

করোনাকালে সরকারের মনোযোগ স্বাস্থ্য খাতে যত বেশি নিবদ্ধ ছিল ততই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বাজার লাগামহীন হয়েছে। এমনকি অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের সুযোগ কমে যাওয়ায় প্রচুর বাড়তি বিনিয়োগ হয়েছে ধান-চাল মজুদ খাতে। ফলে বাজারে চালের প্রবাহ কমে গেছে এবং তাতে দামও ক্রমাগত বেড়েছে। এই পরিস্থিতির শিকার বেকার, অর্ধবেকার ও অনিয়মিত কাজের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী। অথচ বাংলাদেশে ক্রমাগত চালের উৎপাদন বাড়ছে এবং ইতোমধ্যে দেশটি বিশ্বে চাল উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে চলে এসেছে। কিন্তু দেশের ভোক্তা সমাজ এই বাড়তি উৎপাদনের সুফল পাচ্ছে না। বর্তমানে দেশের কৃষিসমাজ প্রায় পৌনে চার কোটি টন চাল উৎপাদন করে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো নাজনীন আহমেদ ২০২১ সালের ১৫ জুন প্রথম আলোকে বলেছেন, 'আমরা গবেষণা করে দেখেছি দেশের চালের বাজার হাতে গোনা কিছু চালকলমালিক নিয়ন্ত্রণ করে। তারা ধান কেনা, চাল প্রক্রিয়াজাত করা থেকে শুরু করে দেশের ভেতরে বাজারজাত কাঠামোও নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি চাল আমদানি-রপ্তানিও তাদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে দেশে চালের উৎপাদন বেড়ে গেলে কৃষকদের চেয়ে ওই চালকলমালিক গোষ্ঠীর লাভ বেশি হয়।'

চাল ছাড়াও সকল পণ্যে ব্যাপক দাম বৃদ্ধি

৬ আগস্ট ২০২১ দৈনিক যুগান্তর ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের তথ্য উদ্বৃত করে লিখেছে, টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে চাল কেজিতে ৮ টাকা বেড়ে ৬৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। মাঝারি আকারের চাল কেজিতে ৬ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫৬ টাকায়। এতে গত বছরের চেয়ে দাম বেড়েছে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ। মোটা চাল কেজিতে ৭ টাকা বেড়ে ৫০-৫২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এতে আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে ১৪ দশমিক ১২ শতাংশ।

একই সময়ের ব্যবধানে খুচরা বাজারে বোতলজাত সয়াবিন লিটারে ৪৫ টাকা বেড়ে ১৫০ টাকা বিক্রি হয়েছে। এতে দাম বেড়েছে ৪১ দশমিক ৪৬ শতাংশ। পাঁচ লিটারের সয়াবিনের বোতল ২০০ টাকা বেড়ে ৭০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বৃদ্ধির হার ৪৩ দশমিক ১৬ শতাংশ । পাম তেল (লুজ) প্রতি লিটারে ৫০ টাকা বেড়ে ১১৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ৬২ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

বড় দানার মশুর ডালে কেজিতে ৫-১০ টাকা বেড়ে ৮০-৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। খোলা আটা কেজিতে ২-৪ টাকা বেড়ে ৩২-৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কেজিতে পাঁচ টাকা বেড়ে দেশি পেঁয়াজ ৫০ ও আমদানি করা পেঁয়াজ ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি আমদানি করা রসুন কেজিতে ৫০ টাকা বেড়ে ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া খুচরা বাজারে শিশুখাদ্যের মধ্যে গুঁড়া দুধ কেজিতে ২০-৫০ টাকা বেড়ে ৬২০-৬৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতি কেজি চিনি ৭ টাকা বেড়ে ৭২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতি কেজি লবণ বছরের ব্যবধানে ৫ টাকা বেড়ে ৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। খুচরা বাজারে মাছ-মাংসও বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দরে। গত বছর একই সময়ের তুলনায় প্রতি কেজি গরুর মাংস ২০ টাকা দাম বেড়ে ৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দেশি মুরগি বছরের ব্যবধানে কেজিতে ৫০ টাকা বেড়ে ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রুই মাছ কেজিতে ৩০-৪০ টাকা বেড়ে ৩৫০-৩৬০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এরকম বৃদ্ধির কারণে অনেক পণ্যই আর শ্রমজীবীরা কিনতে পারছে না। বাকিগুলোও তাদের অল্প অল্প করে কিনতে হচ্ছে।

বাজেট বরাদ্দে শ্রম খাত সবার পেছনে

বাংলাদেশের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট ছিল দেশের ৫০তম বাজেট। এই বাজেটের থিম ছিল জীবন জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ। তবে এই বাজেটে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এর পূর্ববর্তী বছরের বাজেটেও এই মন্ত্রণালয় সর্বনিম্ন ঐ অবস্থানে ছিল। ২০২০-২১ অর্থ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল ৩৫০ কোটি টাকা। সংশোধিত হয়ে সেটা দাঁড়ায় ৩৪৮ কোটি টাকা। এবার ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই মন্ত্রণালয় বরাদ্দ পেয়েছে ৩৬৫ কোটি টাকা।

শ্রমিক ও শ্রম বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের অপর মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য এ বছরের বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে ৭০২ কোটি টাকা। গত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ঐ মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৩৯ কোটি টাকা।

এই উভয় মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বরাদ্দ পেয়েছে এবার ১ হাজার ৬৭ কোটি টাকা। যা সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য মোট বরাদ্দের দশমিক ১৭ ভাগ। উল্লেখ্য, গতবছরও এই দুই মন্ত্রণালয়ের হিস্যা ছিল একই পরিমাণ। অর্থাৎ কোভিড দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী শ্রমজীবীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হলেও শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ খাতের বরাদ্দ হিস্যা বাড়েনি এবং বাড়ছে না।

অন্যভাবে বললে, দেশের প্রায় ৬-৭ কোটি শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখাশোনার জন্য নির্ধারিত মন্ত্রণালয়গুলোর বরাদ্দ জাতীয় বরাদ্দের এক ভাগও নয় এখনও। এই অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থারই প্রায় হুবহু জের। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০১৭ সালেও সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্মিলিত বরাদ্দের মাঝে আলোচ্য দুই মন্ত্রণালয়ের হিস্যা ছিল দশমিক ১৭ ভাগ। অর্থাৎ কেবল গত দুই অর্থ বছরেই নয়, চার বছর আগের তুলনায়ও এই দুই মন্ত্রণালয় সম্মিলিত বরাদ্দে এগোতে পারেনি। ২০১৭ সালে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৫ লাখ ৩৫ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। আর সেই সময় আলোচ্য দুই মন্ত্রণালয় পেয়েছিল ৯৫৬ কোটি টাকা মাত্র।

শ্রমখাতের দুটি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ চিত্র, ২০২০-২১ থেকে ২০২১-২২

সাল	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	উভয় মন্ত্রণালয় মিলে প্রাপ্ত বরাদ্দ	সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য বরাদ্দ	মোট বরাদ্দে এই দুই মন্ত্রণালয়ের হিস্যা
২০২১-২০২২	৩৬৫ কোটি	৭০২ কোটি	১০৬৭ কোটি	৬০৩৬৮১	.১৭%
২০২০-২১	৩৫০ কোটি	৬৪২ কোটি	৯৯২ কোটি	৫৬৮০০০	.১৭ %

উল্লেখ্য শ্রম মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে বরাদ্দ পায় সেটাও পুরোপুরি শ্রমিকদের জন্য সরাসরি খরচ হয় না। মন্ত্রণালয়ের বাজেটের একটা অংশ থাকে পরিচালনা ব্যয় এবং কিছু থাকে উন্নয়ন ব্যয়। সর্বশেষ বাজেটে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের প্রাথমিক উপস্থাপন থেকে দেখা যায়, সেখানে পরিচালন খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১৭৯ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। আর উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ১৮৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা।

কীভাবে খরচ হয় বাজেটের অর্থ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে বিভাগগুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেটের টাকা ব্যয় হবে তা হলো: সচিবালয়, শ্রম অধিদপ্তর এবং কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। সচিবালয় ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য কাজ করবে। যার মধ্যে আছে তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিরসন বিষয়ক দুইটি প্রকল্প। এর বাইরে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনেও কাজ করবে তারা। যেখানে বরাদ্দ রয়েছে ৯২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

এর বাইরে শ্রম অধিদপ্তর দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদার করতে রাঙামাটির ঘাঘড়ায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং নারায়নগঞ্জ বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ৫ শয্যা বিশিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র তৈরির ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। তার জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

তৃতীয়ত চলতি বাজেটে দেখানো আছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। যার লক্ষ্য হিসেবে রয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। এছাড়া এই সংস্থার কাজের তালিকায় রয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ জেলায় কার্যালয় স্থাপন, নির্বাচিত তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপন। এসবের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। লক্ষ্য করার বিষয়, সরকারের এই প্রকল্পগুলো বেশির ভাগই ৩-৫ বছর মেয়াদি। অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো প্রকল্পগুলোতেই এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব কাজের কয়েকটি বাদে বেশির ভাগের কর্মকান্ড শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা অধিদপ্তরের নিয়মিত কর্মকান্ডের মধ্যে পড়ে। সরকারি এই প্রকল্পগুলো কতটা শ্রমিকদের দক্ষতা বা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে নব আঙ্গিকে ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা ভেবে দেখা দরকার।

দেশে দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রশ্নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যতম মুখ্য প্রশাসনিক হাতিয়ার। মহামারির আমলে বিপুল শ্রমজীবী কাজ হারানোর কারণে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বিপরীতে বরাদ্দ বাড়েনি।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত প্রধান এক লক্ষ্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বাজেটে শুধু তৈরি পোশাক খাতসহ অল্পকিছু প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের শ্রমমান উন্নয়নের বিষয় নিয়ে কাজের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখন প্রায় ৮৫ ভাগ শ্রমজীবী অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে যুক্ত। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের কর্মক্ষেত্র উন্নয়ন বা নিরাপত্তা সম্পর্কে মোটাদাগে কিছু বলা হয়নি বাজেটে। অথচ আলোচ্য বাজেট তৈরিকালেও দেশের সক্রিয় শ্রমশক্তির বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ছিল। যা গ্রামে ৮৮.১ শতাংশ এবং শহরে ৭৭.৩ শতাংশ। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের একটি বড় অংশও অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করছে। শিল্পখাতে ৯০ শতাংশ এবং সেবাখাতে ৭২ শতাংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করছিল। প্রায় ৪৫.৫ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কোন কর্মসংস্থান এবং আয় নেই। ২.৭ মিলিয়ন মানুষ বেকার। এই বিশাল শ্রমশক্তির কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তারা চলমান সামাজিক সুরক্ষাবলয়ের বাইরে পড়েছিলেন। মহামারির ধাক্কা সহ্য করার মত নূন্যতম সার্মথ্য ছিল না তাদের। মহামারি এই শ্রমিকের অসহায়ত্বকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। অসহায় এই শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা বা বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বাজেটে।

এছাড়া শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিক থেকে এবারের বাজেটে তাদের জনপ্রিয় দাবিগুলোর বিষয়েও কোন উল্লেখ নেই। যেমন শ্রমিকদের রেশন, পেনশন, চিকিৎসা ও আবাসন সংকট বিষয়ে বৃহদায়তন কোন কর্মসূচির উল্লেখ নেই।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বাজেট বিষয়ক এক আলোচনা সভায় বলেছেন, ৫০ বছর আগে আদমজী পাটকলে শ্রমিকদের আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজ স্বাধীন দেশে শ্রমিকরা অধিকতর 'আধুনিক শিল্প'-এ সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিক নেতা রাজেকুজ্জামান রতন তাঁর এক বাজেট প্রতিক্রিয়ায় দেশরূপান্তর পত্রিকায় ৫ জুন বলেছেন, '৬ কোটি ৮২ লাখ শ্রমজীবীর মধ্যে করোনায় কাজ হারিয়েছে ১ কোটি ৫৬

লাখ শ্রমিক, যাদের কাজ আছে তাদের আয় কমেছে ২০ শতাংশ, কাজ না থাকায় খাদ্য ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছে ৫২ শতাংশ, 'রেমিট্যান্স সৈনিক' বলে আখ্যায়িত শ্রমিকরা ২২.৭৫ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন বলে সরকারিভাবে স্বস্তি প্রকাশ করা হয়েছে– কিন্তু ৬ লাখের বেশি প্রবাসী শ্রমিক দেশে ফিরেছে, তাদের জন্য বাজেটে সন্তোষজনক কোন আশ্বাসবাণী নেই। তাছাড়া প্রতি বছর শ্রমের বাজারে আসে ২২ লাখ তরুণ যুবক তাদের কর্মসংস্থানের কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বাজেটে নেই। বলা হয়েছে, আইটি সেক্টরে ১০ লাখ কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন চিত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাজেটে।' এমনকি মহামারিকালে জরুরিভাবে শ্রমজীবীদের টিকা দেয়ার জন্যও বাজেটে বিশেষ ও স্বতন্ত্র কোন বরাদ্দ দেখা যায়নি। যদিও ২০২১ সালের শেষার্ধে শিল্প ও ব্যবসার জগতে সবাই বলছিল, অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হলে শ্রমিকদের ব্যাপক হারে টিকা প্রদানের বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য, এবারের বাজেট ছিল বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট। বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা। আয় ধরা হয়েছে ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা। ঘাটতি আছে ২,১৪,৬৮১ কোটি টাকা।

দেশের প্রায় ৬-৭ কোটি শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখাশোনার জন্য নির্ধারিত মন্ত্রণালয়গুলোর বরাদ্দ জাতীয় বরাদ্দের এক ভাগও নয় এখনও। এই অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থারই প্রায় হুবহু জের। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০১৭ সালেও সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্মিলিত বরাদ্দের মাঝে আলোচ্য দুই মন্ত্রণালয়ের হিস্যা ছিল দশমিক ১৭ ভাগ।

বাজেট বিষয়ে স্কপের স্মারকলিপি

কেন্দ্রীয় কমিটি
৪ রাজউক এভিনিউ (পুরাতন শ্রম ভবন, দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১০০০।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি/ ১৪ জুন ২০২১

বাজেটে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবিতে জাতীয় সংসদের মহামান্য স্পিকারের প্রতি স্কপের স্মারকলিপি পেশ

গত ৩ জুন ২০২১ মহান জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট উত্থাপিত হয়েছে। এটা করোনাকালের দ্বিতীয় বাজেট। এই দুর্যোগেও রেমিটেন্স, কৃষি, শিল্প, সেবাখাত মিলে বাংলাদেশের যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তার ফলে জিডিপির আকার বেড়ে ৩০ লাখ কোটির বেশি দাঁড়িয়েছে এবং বাজেটের আকারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের বাজেটের আকার ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। গত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৬৫ হাজার কোটি টাকা বেশী। করোনাকালেও শ্রমজীবী মানুষ তাদের ভূমিকা পালনে অবহেলা করেনি তাই জিডিপি বৃদ্ধি এবং বিশাল এই বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ বাজেটে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটেনি। বাজেটের বিশালত্ব নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী গর্ব করলেও বাজেটে শ্রমিকদের জন্য সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে স্কপ যুগ্ম সমন্বয়ক সহিদুল্লাহ চৌধুরির সভাপতিত্বে ৮ জুন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের অনুষ্ঠিত সভা থেকে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৪ জুন ২০২১, স্কপের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের প্রতি বাজেটে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্কপের পক্ষে জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি শিরিন আক্তার, এম.পি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন।

স্কপ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নেতৃবৃন্দ ডা: ওয়াজেদুল ইসলাম খান, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, সাইফুজ্জামান বাদশা, রাজেকুজ্জামান রতন, কামরুল আহসান, চৌধুরি আশিকুল আলম, শামীম আরা, নঈমুল আহসান জুয়েল, শাকিল আক্তার চৌধুরী, আহসান হাবিব বুলবুল, পুলক রঞ্জন ধর, ফিরোজ হোসেনের পক্ষে স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক সহিদুল্লাহ চৌধুরী ও নূর কুতুব মান্নান স্বাক্ষরিত স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের কাছে দেশের শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরেন-

১. ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমুল্যের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য শ্রমিক কর্মচারীসহ নিম্নআয়ের মানুষের জন্য রেশন ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সুলভ মূল্যে আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বরাদ্দ করা।

২. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত হলে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসনসহ সামাজিক বেষ্টনির জন্য বরাদ্দ রাখা।

৩. বাজেটে পাট, চিনিশিল্প পূনরুদ্ধার ও রক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা।

৪. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা সামজিক সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা। শিল্পঘন এলাকায় শ্রমজীবী হাসপাতাল, শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা।

৫. অর্থ পাচারকারী, ঋণ খেলাপীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে প্রাপ্ত অর্থ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা।

৬. দুর্নীতিরোধে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ না রেখে তা বাজেয়াপ্ত ও আদায় করে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়া।

৭. শ্রমজীবীদের জন্য সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা।

৮. করোনায় কর্মহীন ও ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সহায়তার বরাদ্দ করা।

৯. ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

বার্তা প্রেরক: আহসান হাবিব বুলবুল

২০২১ সালে শ্রমিকদের মাথাপিছু আয়ও কি তবে বেড়েছে?

মাহা মির্জা

২০২১ সালের ২৩ মে বাংলাদেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছিল মাথাপিছু –আয়ে দেশটা ভারতকে ছাড়িয়েছে। গতবছর আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৬৪ ডলার। ঐ সংবাদ প্রকাশকালে ওটা হয়েছে ২ হাজার ২২৭ ডলার। তখন ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৯৪৭ ডলার।

এই সংবাদের পরের দিন দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলো কেউ লিখেছে, 'বাংলাদেশ ভারত থেকে এগিয়ে গেলো'! কেউ লিখেছে, 'ভারত বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে পড়লো!' কেউ লিখেছে, ভারতীয়দের থেকে ২৩ হাজার টাকা বেশি আয় করছি আমরা!'

ঠিক দুদিন পর পাকিস্তানের বিশ্বব্যাংক পরামর্শক আবিদ হাসান লিখলেন: ২০৩০ সালের মধ্যে পাকিস্তানকে হয়তো বাংলাদেশ থেকে সাহায্য (aid) নিতে হবে। যদিও পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করতেই এটা লেখা হয়েছে– কিন্তু এই খবরে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা খুব আরাম পেলো।

এর ঠিক ১০ দিনের মাথায় ব্লুম্বার্গে কলাম লিখলেন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ মিহির শর্মা। কলামের শিরোনাম: South Asia should pay attention to its standout star.

আরো উত্তজনা তৈরি হলো। শীর্ষস্থানীয় কিছু পত্রিকা কলামটি হুবুহু অনুবাদ করলো। এরই মধ্যে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড ছাড়ালো।

একই সময় রিজার্ভ থেকে শ্রীলংকাকে ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিলো বাংলাদেশ। কেউ প্রশ্ন করলো না, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কম কম খেয়ে দেশে টাকা পাঠানো আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা মহামারীর মধ্যে কেমন আছে? তারা নিকটজনসহ তিনবেলা খেতে পাচ্ছে তো?

গত এক বছর ধরে মহামারীতে দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়া নিয়ে অনেকগুলো জরিপ প্রকাশিত হয়। প্রতিটা জরিপ বলছে কভিডের মধ্যে বেকারত্ব বেড়েছে, দারিদ্র্য বেড়েছে এবং আয় কমেছে। গতবছর জুন মাসে প্রকাশিত ব্র্যাকের জরিপে দেখা যায়, সোয়া পাঁচ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ২ ডলারেরও নিচে নেমেছে। গত বছর অক্টোবরে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ বলছে, করোনায় সারাদেশের মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ। ২০২১-এর এপ্রিলে প্রকাশিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) জরিপ বলছে পোশাক, চামড়া, নির্মাণ ও চা– এই চার খাতের ৮০ শতাংশ শ্রমিকেরই মজুরি কমেছে (এর মধ্যে ৬৬ শতাংশ শ্রমিক আত্মীয়দের থেকে

ধারকর্জ করেছেন এবং ২০ শতাংশ এনজিও থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছেন)। একই সময় প্রকাশিত পিপিআরসি (পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার) এবং ব্র্যাকের যৌথ জরিপ বলছে, গত এক বছরে দেশের আড়াই কোটি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে। একই সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজের জরিপ বলছে মহামারীর মধ্যে দেশের ৫০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান ৭৬ শতাংশের উপরে শ্রমিক ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে।

এসব প্রতিবেদন পড়লে এবং বাংলাদেশের মাথাপিছু গড় আয় সংক্রান্ত খবর শুনলে স্বভাবত প্রশ্ন জাগে আয় কার বাড়লো এবং কীভাবে বাড়লো?

যদিও শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল নতুন দারিদ্র্য সাময়িক, কিন্তু একটা গোটা বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়া মানুষেরা দারিদ্র্য থেকে বেরুতে পারেনি। কিন্তু তারপরও মাথাপিছু আয় ১৭ হাজার টাকা বাড়লো কীভাবে?

বলা হচ্ছে রেমিটেন্স বেড়েছে তাই বহু পরিবারের আয় বেড়েছে। রেমিটেন্স বেড়েছে এ কথা সত্য। ২০২১-এর মে-জুনে রেমিট্যান্স আগের সব রেকর্ড ভেঙে দাঁড়িয়েছে ৪৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এই মহামারীর মধ্যে আসলেও কি রেমিট্যান্স বেড়েছে? নাকি মহামারীর মধ্যে হুন্ডির আদানপ্রদান কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেড়ে গেছে সরকারি চ্যানেলে টাকা পাঠানোর পরিমান? এসব বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেখা যায় না।

করোনার মাঝে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী শ্রমিকদের অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন। বহু ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং নির্মাণ কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক শ্রমিক/কর্মচারি কাজ হারিয়ে বিদেশে আটকে ছিলেন ও আছেন। ব্র্যাকের সমীক্ষা বলছে ১৪ লাখ প্রবাসী শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। রামরুর সমীক্ষা বলছে এর মধ্যে সোয়া তিন লাখ দেশে ফেরত এসেছে। এই অবস্থায় প্রবাসী শ্রমিক রেমিট্যান্স পাঠিয়ে রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন? কতটা সম্ভব তা?

রামরু বলছে প্রায় ৭০ ভাগ অভিবাসী পুরুষকর্মীর পরিবার এসময় ধারদেনা করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রবাসী শ্রমিকের টাকা পাঠানো বাড়েনি। বাড়ার কথা নয়। তাহলে আয়টা বাড়লো কার?

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, ঠিক করোনার বছরেই মোট ১০ হাজার নতুন কোটিপতি যুক্ত হয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থায়! আর ৫০ কোটি টাকার উপরে আমানত রেখেছে এমন একাউন্টের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৯০-এ! বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলছেন, ব্যাংক থেকে লুট করে একটি শ্রেণি কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন। আবার তারাই ব্যাংকে টাকা রাখছেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ওয়েলথ-এক্সের প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম, আড়াইশ' কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিকদের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি হারে বাড়ছে। এদিকে মহামারীর মধ্যেও বড় বড়

প্রকল্পগুলোর কাজ থেমে ছিল না। তার মানে বড় অংকে আয়-রোজগার অবশ্যই বাড়ছে কারো কারো। তাদের মধ্যে শ্রমিকদের বাড়ার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যান মাথাপিছু আয় বাড়ার কথা জানাচ্ছে।

জিডিপি, মাথাপিছু আয়, বা দারিদ্র্যসীমার মতো সূচকগুলো আপাতদৃষ্টিতে নির্মোহ ইকোনোমিক মডেলিং এর ফসল। যেমন দারিদ্র্যসীমা নিয়ে ভারতে বহু বছর তুমুল বিতর্ক চলেছে। কোন পদ্ধতিতে মাপা হবে দারিদ্র্য? দৈনিক কত রূপি, কত ক্যালোরি গ্রহণ করলে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে পারবে দরিদ্র মানুষ? এইসব তর্কাতর্কির মধ্যে দারিদ্র্য পরিমাপে একেকসময় একেক কমিটি গঠিত হয়েছে ভারতে। ২০০৭ সালে সেনগুপ্তের রিপোর্ট দেখিয়েছিলো, ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭ ভাগ। বিব্রত সরকার নতুন কমিটি করে। ২০০৯ সালে সাক্সেনা কমিটি দেখায়, ৭৭ শতাংশ নয়, ভারতের ৫০ শতাংশ মানুষ গরিব। ২০১১ সালে তেন্ডুলকার কমিটি দৈনিক ন্যূনতম আয়ের শর্ত মাত্র ৩২ রূপিতে নামিয়ে এনে ঘোষণা দেয়, ৫০ শতাংশ নয়, ভারতের মাত্র ২২ ভাগ মানুষ গরিব। অর্থাৎ একেক কমিটি এসে দারিদ্র্যসীমার লাইন টেনে টেনে নামাতে থাকে আর রাতারাতি পঁচিশ তিরিশ কোটি ভারতীয়ের গরিবি দূর হয়ে যায়। দারিদ্র্য কম করে দেখানোর এজেন্ডা থেকে দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞাও পাল্টাতে থাকে। কিন্তু দারিদ্র্যসীমার এই দড়ি টানাটানিতে গরিবের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়?

ভারতের প্রবৃদ্ধি যখন নিয়মিত ৭-৮ শতাংশ, তখনো বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের তালিকায় ভারত ছিল শীর্ষে। ভারতকে যখন বলা হচ্ছে 'সুপার পাওয়ার' ঠিক তখনি ১৯ কোটি ভারতীয় নিয়মিত অপুষ্টিতে ভুগেছে, আর প্রতি আধাঘন্টায় আত্মহত্যা করেছে একজন করে ভারতীয় কৃষক। ৮ শতাংশ জিডিপির সময় ভারতীয় অর্থনীতিবিদ উৎসা পাটনায়েক লিখেছিলেন তার বিখ্যাত বই, 'রিপাবলিক অফ হাঙ্গার'। দেখিয়েছিলেন, বেঁধে দেয়া দারিদ্যসীমা ৩২ রূপিতে মানবদেহের জন্যে প্রয়োজনীয় ২৪০০ ক্যালোরির খাদ্য কেনা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, বরং কিছু কিছু রাজ্যে এই দারিদ্র্যসীমায় ১৫০০ ক্যালোরির খাদ্যও মিলবে না। কৃষিবিদ বন্দনা শিবা বলেছিলেন, মিস ইন্ডিয়ার মতো 'জিরো ফিগার' হতে চাইলে দৈনিক ১৫০০ ক্যালোরি ঠিক আছে, কিন্তু ভারতের কোটি কোটি কৃষক মাঠে কাজ করে, ফসল বোনে, ফসল কাটে। কৃষকের শরীরে দৈনিক ২৪০০ ক্যালোরি অপরিহার্য। অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমা কোনো খেলার দড়ি নয় যে ইচ্ছামতো কমাবেন।

এদিকে আমাদের দেশের স্বয়ং বিবিএস বলছে গত এক দশকে সামগ্রিকভাবে মানুষের ক্যালোরি গ্রহণের পরিমান কমেছে (বিবিএস, খানা আয় ও ব্যায় জরিপ, ২০১৬)।

জিডিপির হিসাব নিয়ে আমাদের অর্থনীতিবিদের একটা সাধারণ কথা হলো–সরকারি জিডিপি হিসাবের আগা মাথা তারা ধরতে পারেন না। জিডিপির হিসাব নিয়ে স্বয়ং পরিসংখ্যান বিভাগের একজন সাবেক সচিব প্রথম আলোকে বলেছিলেন (২২ আগস্ট ২০২০), 'জিডিপি কত হবে, তা আগে ঠিক করা হয়। পরে 'ব্যাক ক্যালকুলেশন' করে হিসাব মেলানো হয়'। ২০১৯ সালে দৈনিক কালের কণ্ঠ বিবিএসের খানা জরিপের গোজামিল নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপে। প্রতিবেদকের ভাষায়, 'মাঠ পর্যায়ে যখন খানা আয়-ব্যয় জরিপের কাজ চলছিল তখন...প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কেউ নিয়মমতো তদারকিতে যাননি। এই সুযোগে ৬৪ জেলার পরিসংখ্যান কর্মকর্তারাও গণনাকারীদের কাছে যাননি। ফলে গণনাকারীরাও বাড়ি বাড়ি না গিয়েই নিজেদের খেয়ালখুশিমতো তথ্য জুড়ে দিয়েছেন ফরমে।' এ প্রতিবেদনে গোপালগঞ্জ পৌরসভার এক পরিসংখ্যান কর্মকর্তার ভাষ্য ছিল এরকম 'আমরা করবটা কী? গণনাকারী নিয়োগেও চেয়ারম্যান-মেম্বাররা নিজের লোক ঢুকিয়ে দেন। ওরা সব আনাড়ি, পরিসংখ্যানের কাজ কিচ্ছু জানে না...এভাবে রাজনৈতিক নিয়োগের লোকজন দিয়ে কোনোদিন সঠিক তথ্য উপাত্ত মিলবে না' (কালের কণ্ঠ, ২০১৯)।

কিন্তু সর্বশেষ বছরগুলোতে দারিদ্র্য বেড়েছে না কমেছে সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আমাদের কান্ডজ্ঞান কী বলে? গত একবছরে ঢাকার ১০ লাখ রিক্সাওয়ালার আয় ঠিক কোন সময়টাতে বাড়লো? ঢাকার ৫ লাখ ঠিকা বুয়ার আয় ঠিক কোন সময়টাতে বাড়লো? করোনার মাঝে বিপুল গার্মেন্টস শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছেন। বন্ধ বা লে-অফ ঘোষণা হয়েছে শত শত কারখানা। গত এক বছরে বহু এলাকার হাজার হাজার শ্রমিক ঠিকমতো বেতন ভাতা পাননি। বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলগুলোর ৪০ হাজার শ্রমিকদের পাওনা এ বছরের মাঝামাঝিও কিছুটা বাকি ছিল। হোটেল রেস্টুরেন্টে কাজ করা ২০ লাখ কর্মী ২০২০ এবং ২০২১-এর বহু মাস পুরো সময়টাতে বেকার বসে ছিলেন। পরিবহন শ্রমিকদের একটা বড় অংশও মাসের পর মাস ধার কর্জ করে চলেছে। ঢাকার রাস্তায় শার্ট প্যান্ট পরা ভিখারির সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছিল। তাহলে আয়টা বাড়লো কার? কীভাবে?

[২৮ জুন ২০২১; প্রথম আলোর সৌজন্যে, কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে]

‘লকডাউন’কালে পোশাক শ্রমিকদের পুনঃপুন হয়রানি

মহামারির কালে শ্রমিক হয়রানির বড় এক নজির স্থাপিত হয় তৈরি পোশাক খাতে ইচ্ছামতো কারখানা খোলা ও বন্ধ করার একাধিক ঘটনায়। ২০০০ সাল থেকে এই অনাচার শুরু হলেও ২০২১-এর প্রথম দিকেও তা অব্যাহত ছিল। ২০০০ সালের এপ্রিলে প্রথমে করোনা পরিস্থিতির মাঝে শ্রমিকদের বেতন না দেয়ার ভয় দেখিয়ে কারখানায় আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। আবার ফেরার পরই তাদের জানানো হয় কারখানায় এখন ছুটি থাকবে। এই উভয় ঘটনা মহামারির ভীতিকর পরিস্থিতির মাঝে শ্রমজীবীদের সঙ্গে বিপজ্জনক এক তামাশা হিসেবে সমালোচিত হয়।

কিন্তু তারপরও ২০২১-এর জুলাইয়ের শেষার্ধে সরকার ঘোষিত লকডাউন থাকাবস্থায় (২৩ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট) কারখানাসমূহে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলা হয়। অথচ ঐ একই সময় সরকারি নির্দেশে দেশের স্থল ও নৌ পরিবহন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। বলা হচ্ছিলো, এটা ‘কঠোর লকডাউন’ এবং সেটা লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিদিন শত শত মানুষকে জেল জরিমানা করা হচ্ছিলো।

কিন্তু কারখানা খোলার সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে চাকুরি বাঁচাতে শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় এসে কাজে যোগ দিতে হয়। করোনার সময়ে আর্থিক অনটনের কারণে কোন শ্রমিকই নতুন করে চাকুরি হারাতে চাইছিল না। দেশের আনাচে কানাচে রাস্তাঘাটে– চাকুরি রক্ষায় উদভ্রান্ত হয়ে হাটতে থাকা শ্রমিকদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে দেশব্যাপী ধিক্কার ও প্রতিবাদ উঠলেও বিজিএমই কিংবা সরকারকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে দেখা যায়নি।

মহামারির দিনগুলোতে কেবল কারখানা খোলা বা বন্ধের নামেই নয়, ২০২১-এ উৎসবের সময়েও শ্রমিকদের বাড়িতে যাওয়ার সময় যাতায়াতের সংকটে পড়তে হয়েছে। উৎসবের জন্য দেশ ছুটিতে থাকলেও শ্রমজীবীদের গ্রামের বাড়িঘরে যাওয়ার জন্য যানবাহনের সংস্থান করা হয়নি। উৎসবের বড় ছুটিতে শ্রমজীবী মানুষ যে গ্রামের বাড়িতে যায় এটা বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের পুরানো ঐতিহ্য। যা শিল্প মালিক এবং দেশের নীতিনির্ধারকদের অজানা থাকার কথা নয়। তারপরও শ্রমিকদের বিড়ম্বিত হতে হয়। গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেয়া হয়নি তখন। ফলে ট্রাকে চড়ে গাদাগাদি করে কিংবা পায়ে হেটে শ্রমিকদের নিকটজনের কাছে যেতে হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষদের কারখানায় ছুটি দিয়ে রাস্তায় গাড়ি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তখন।

বিভিন্ন সময়ে একই সঙ্গে লকডাউন এবং কারখানা খোলা-রাখার এরকম স্ববিরোধী ঘোষণায় পোশাক খাতের শ্রমিক কর্মচারিরা কেবল শারীরিকভাবেই নয় আর্থিকভাবেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকেই বাড়িতে আসা-যাওয়ায় ১০-১৫ গুণ অর্থ বেশি ব্যয় করেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ এর মাঝামাঝি, ১৭ জুলাই নতুন করে লকডাউন শুরুর সময় দেশের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ঘোষণাটি এরকম: ‘ঈদের পর ২৩ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিধিনিষেধ কঠোর হবে। সবকিছুই বন্ধ থাকবে তখন। এটা হলে আমার মনে হয় কোভিড পরিস্থিতি ভালো নিয়ন্ত্রণে আসবে।’ (প্রথম আলো, ১৭ জুলাই)। অথচ ৩০ জুলাই আরেক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়: উপরোক্ত লকডাউনের মাঝেই তৈরি পোশাকসহ সকল শিল্প কারখানা খোলা থাকবে।

মহামারিকালে পোশাক খাতকে ঘিরে সরকার ও পোশাক মালিকদের বিভিন্ন সময়কার উপরোক্ত ধাঁচের স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্যও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। বছরের প্রথম দিকে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসলেও মাঝামাঝি সেটা আবার বাড়তে থাকে। করোনাভাইরাসের ছোবল ক্রমে বাড়তে থাকার মুহূর্তে স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষক ও বিজ্ঞজনেরা বিপুলসংখ্যক মানুষের দীর্ঘ যাত্রা ও দেশের এক স্থান থেকে অপর স্থানে আসা-যাওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের নোটিশে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মচারিকে বারবার শিল্পাঞ্চল ছাড়তে বাধ্য করা এবং আবার হঠাৎ হঠাৎ আসতে বাধ্য করার মধ্যদিয়ে ভাইরাস ছড়ানোর সুযোগই করে দেয়া হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বার বার হুঁশিয়ার করেছিলেন।

সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের উদ্যোগে ২৯ জুলাই একদল ব্যবসায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে যত দ্রুত সম্ভব শিল্পকারখানা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করার কারণে লকডাউনের মাঝেই কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত হয়। আবার কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত হওয়ার পরও বাস-লঞ্চসহ সকল পরিবহন ছিল অন্তত দুদিন বন্ধ। পরে শ্রমিকদের আহাজারির মুখে তৃতীয় দিন পরিবহন চলাচলের অনুমতি দেয়া হলেও আরেক সংকট তৈরি হয়। পরিবহন মালিকরা এসময় কয়েক গুণ বেশি ভাড়া আদায় করতে থাকে শিল্পাঞ্চলমুখী শ্রমিকদের কাছ থেকে। এর প্রতিবাদে দেশের কয়েকস্থানে বিক্ষোভও করেছে শ্রমিকরা। এ বিষয়ে ২ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে পোশাক শ্রমিক জামাল উদ্দিন বলছিলেন, 'করোনার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছি। সকালে কারখানায় যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। কিন্তু যেতে পারছি না বেশি ভাড়ার কারণে। আগে যেখানে যেতাম ২০ টাকায় এখন সেখানে ভাড়া চাইছে ১০০ টাকা। এ কারণে হেঁটে কারখানায় যাচ্ছি।'

আরেক শ্রমিক রহিমা আক্তার জানান, তার বাসা থেকে কারখানায় আসতে লোকাল বাসে ১০ থেকে ১৫ টাকা ভাড়া লাগে। বাস না থাকায় অটোরিকশা দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি। সেখানে ভাড়া চাওয়া হচ্ছে ১২০ টাকা। বাধ্য হয়ে ৮০ টাকা দিয়ে কাজে এসেছেন।

করোনাকালে এসব দৃশ্যে মধ্যদিয়ে মনে হচ্ছিলো দেশের রপ্তানি আয় ধরে রাখার সব দায় কেবল শ্রমিকদের এবং তাদের প্রতি যেকোন নিষ্ঠুর আচরণ করা যায়। শ্রমিকদের প্রতি নীতিনির্ধারক ও মালিকদের প্রকৃত মনোভাব কী রকম সেটাই মহামারির সময়কার উপরোক্ত অভিজ্ঞতাসমূহে প্রকটভাবে ধরা পড়ে। দেশে করোনার ভয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ বন্ধ তখন নীতিনির্ধারকরা এবং শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের কেন করোনাজয়ী ভাবছিলেন তার কোন ব্যাখ্যা কখনো পাওয়া যায়নি। অথচ এই শ্রমিকরা অনেকে তাদের পরিবারের আয় রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। তাদের করোনা হওয়া মানে পরিবারটির বিপদগ্রস্ত হওয়া এবং অনেক পরিবারে তাই ঘটেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ তাদের এক গবেষণা তথ্য প্রচারমাধ্যমে দিয়ে জানিয়েছে, করোনাকালে ৫৬ শতাংশ তৈরি পোশাক শ্রমিক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে দেনার সম্মুখীন হয়েছে এবং তাঁদের ৭২ শতাংশই চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে পারেননি। (২৪ ফেব্রু, ২০২১)

অন্যদিকে, সিপিডি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে করোনায় বছরের শুরুতে চাকুরিচ্যুত পোশাক শ্রমিকের সংখ্যা ছিল সর্বমোট শ্রমিকের প্রায় ১৪ ভাগ। এই সময় ২৩২টি কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে ১৮০টি বিজিএমইএর সদস্য ছিল। (কালের কণ্ঠ ২৪ জানুয়ারি ২০২১)

টিকায় অগ্রাধিকারের দাবি ছিল শ্রমিকদের

করোনার মাঝে কাজে যেতে হলেও এবং করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে পোশাক খাতের শ্রমিকরা জরুরি জনগোষ্ঠী হলেও টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারের দাবি সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে ২০২১-এ। ৬ সেপ্টেম্বর ডেইলি স্টারের এক প্রতিবেদনে জনৈক পোশাক শ্রমিক নেতা জানিয়েছেন, এখাতের প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের মাঝে ঐসময় পর্যন্ত মাত্র চার লাখ টিকা গ্রহণ করতে পেরেছেন। ডেইলি স্টারের ঐ প্রতিবেদনে দেখা যায় ঢাকার সাভার, আশুলিয়া এবং ধামরাইয়ে কয়েক লাখ শ্রমিক থাকলেও তাদের টিকা দেয়ার মতো বাড়তি কোন কাঠামো নেই সেখানে। এসব এলাকার উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকা সংরক্ষণ করা যায় ২-৩ হাজার মাত্র।

শ্রমিকরা দাবি করছিল কারা কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে তাদের টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করুক। এরকম ব্যবস্থা নেয়া কারখানার সংখ্যা খুবই অল্প বলে উপরোক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। অনেক শ্রমিক জাতীয় পরিচয়পত্রের অভাবেও রাষ্ট্রীয় টিকা উদ্যোগে নিজেদের নাম লেখাতে পারছে না।

প্রবাসী শ্রমিক

দুটি প্রতিবেদন

ভূমধ্যসাগরে ডুবছে আর ভাসছে বাংলাদেশী তরুণরা

করোনার মাঝেই ২০২১ সালে ভূমধ্যসাগরে, লিবিয়া, তিউনিশিয়া ইত্যাদি দেশের উপকূল থেকে বাংলাদেশীদের উদ্ধার ও মৃত্যুর খবর প্রচারিত হয়েছে নিয়মিত। অধিকাংশ তাঁরা কাজের খোঁজে ইউরোপ পৌঁছানোর মরিয়া চেষ্টা করছিলেন। ১৮ মে দৈনিক যুগান্তরে এরকম ৩৩ বাংলাদেশীকে তিউনিশিয়ার নৌবাহিনী কর্তৃক উদ্ধারের বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। উদ্ধারের পরও এদের দুঃখকষ্টময় জীবনের শেষ ছিল না। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, এই বাংলাদেশীদের রাখা হয়েছে একটা তেল উত্তোলন কেন্দ্রে। উদ্ধারকারীদের কাছ থেকে জানা যায়, তাদের সঙ্গে থাকা ৫০ জনের কোন হদিস মিলছিল না।

এদিকে ১৩ জুন ডেইলি স্টার লিখেছে, লিবিয়া থেকে অবৈধ পথে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টাকালে ভূমধ্যসাগর থেকে ৪৩৯ ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হলে তাদের মাঝে ১৬৪ জন বাংলাদেশীকে পাওয়া যায়। লিবিয়ার কোস্টগার্ডের দুটি জাহাজ সাগরে অভিযান চালিয়ে এই মানুষদের ভাসমান অবস্থায় পায়। লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা গাজী মো. আসাদুজ্জামান কবির উদ্ধার পাওয়া বাংলাদেশীদের দেখতে গিয়েছিলেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

২০২১ সালে জাতীয় পত্রপত্রিকা বিভিন্ন সূত্রে জানায় লিবিয়ায় এখন নানা দেশের ইউরোপ যেতে চাওয়া মানুষ রয়েছে প্রায় সাত লাখ। বছরের প্রথম চার মাসে এই দেশ থেকে ইউরোপে ঢুকেছে প্রায় ১১ হাজার মানুষ। যাদের মধ্যে অনেক বাংলাদেশী ছিল। তবে একই সময় ইউরোপ যাওয়ার পথে প্রায় ৭০০ ব্যক্তি মারাও গেছে। এর আগের বছর এরকম মৃতের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪০০ জন। ১৭ জুন প্রথম আলো ভূমধ্যসাগর থেকে আরও ৬৪ বাংলাদেশীকে উদ্ধারের খবর জানিয়েছে। এবার তাদের উদ্ধার করে মিসর।

বিশ্বের ১৭২টি দেশে কাজ নিয়ে যায় বাংলাদেশীরা। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে সরকারিভাবে যায় ৮-১০ লাখ। এদের বেশিরভাগ অদক্ষ শ্রমিক। অন্যান্য ভিসা মিলিয়ে ২০ লাখের বেশি কর্মী বিদেশে যান বলে জানিয়েছে বায়রা। কয়েক লাখ পুরানো প্রবাসী আবার ফিরেনও প্রতি বছর।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি এখন দেশের বাইরে থাকেন। প্রবাসে থাকা এই বাংলাদেশিরা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখলেও প্রবাসীদের নিজস্ব সমস্যা অনেক।

এসব অভিবাসন প্রত্যাশীর নিরাপত্তার যে নৈতিক দায় বিশ্বের রয়েছে, তা মানবাধিকার সংস্থাগুলো নিয়ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অথচ ইউরোপীয় দেশগুলোর মনোভাব হলো: কিছু লোককে ঘোষণা দিয়ে আশ্রয় দিলে অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে ডিঙি ভাসাবে। তার চেয়ে বরং কয়েকটি ডিঙি মাঝদরিয়ায় উল্টে যাক, তাতে অপেক্ষমাণ শরণার্থীরা সাগর পাড়ি দিতে নিরুৎসাহিত হবে।

প্রচার মাধ্যম সূত্রে পাওয়া সাধারণ এক হিসাব থেকে প্রথম আলো দেখিয়েছে, কেবল মে-জুন মাসে ৩০ দিনে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া উপকূলে উদ্ধার পাওয়া বাংলাদেশীদের সংখ্যা ছিল ৫২৯। এর মধ্যে তিউনিশিয়ায় উদ্ধার হয়েছে ৪৪৩ জন। একে গড় চিত্র হিসেবে বিবেচনা করলে এবং বছরজুড়ে এরকম অবস্থার অনুমান করলে অত্র অঞ্চলে বাংলাদেশীদের অবৈধভাবে ইউরোপ যাত্রার এক বিপজ্জনক ছবি ভেসে উঠে।

এভাবে ইউরোপ ঢুকতে চাওয়া বাংলাদেশীদের মূল গন্তব্য থাকে ইতালি। ঢাকা থেকে উড়োজাহাজে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে গৃহযুদ্ধকবলিত লিবিয়ায় পৌঁছান তারা। এরপর সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরের দুর্গম পথে যাত্রা করেন ইতালির উদ্দেশে। মানব পাচারকারীরাই এই পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিপুলভাবে অর্থ আয় করছে। উপরে উল্লিখিত প্রথম আলোর প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে ২০২১-এর ১ জানুয়ারি থেকে ১২ জুন পর্যন্ত এই বিপজ্জনক পথে ইউরোপ পৌঁছতে চাওয়া মানুষ মারা গেছে ৮১৩ জন। এ ছাড়া ২০১৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধার হওয়া ২ হাজার ৯০০ বাংলাদেশি লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন। আইওএম ২০২১-এর ৭ মে জানিয়েছে, ১৬০ বাংলাদেশীকে তারা বাড়ি ফিরতে সহায়তা দিয়েছে। ৪ মে বেনগাজি থেকে এদের ঢাকা নিয়ে আসা হয়। এই মানুষরা স্বেচ্ছায় ফিরে আসতে আবেদন জানিয়েছিল।

লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা গাজী মো. আসাদুজ্জামান কবির ২০২১-এর ১৬ জুন প্রথম আলোকে বলেছেন, লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ডের সহায়তায় গত এক মাসে উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ২২১ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। মানব পাচারকারীদের কবল থেকে উদ্ধার হওয়া ওই ব্যক্তিরা জানিয়েছে, দুবাই থেকে একটি ভাড়া করা উড়োজাহাজে করে তাঁদের লিবিয়ার বেনগাজিতে নেওয়া হয়। এরপর ডিঙি নৌকায় চড়িয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার কাজ শুরু হয়। দুবাই থেকে যাত্রার আগে তাঁদের সবাই ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের ওই দেশে যান। এরপর সাত থেকে আট দিন তাদের সবাইকে দুবাইয়ে রাখা হয়। এই মানুষরা সাগরপথে ইউরোপে ঢুকতে না পেরে অনেক সময়ই নৌকার জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ায় দিনের পর দিন সাগরে ভাসতে থাকে। উল্লেখ্য, এই ঝুঁকিপূর্ণ ভাগ্য পরিবর্তন চেষ্টায় এশিয়া থেকে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের নাগরিকদের সংখ্যাই অত্যধিক। বাকিদের মাঝে মূল অংশ সুদান, মালিসহ আফ্রিকার কয়েকটি যুদ্ধপীড়িত দেশের মানুষ।

উপরে উল্লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথম আলোকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মো. আসাদুজ্জামান কবির ত্রিপোলি থেকে মুঠোফোনে আরো বলেছেন, 'সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর উদ্ধার পাওয়া বাংলাদেশির জন্য তিউনিসিয়ার অভিবাসন অধিদপ্তর, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাসহ (আইওএম) স্থানীয় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে জারজিস, মেদনিন, জারবাহ ও মাহদিয়া শহরে প্রাথমিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। মহামারির নির্ধারিত কোয়ারিন্টিন শেষে এই মানুষদের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও আইওএম কর্তৃক পরিচালিত শেল্টার হাউসে রাখা হয়। এদের মধ্যে যারা দেশে ফিরতে আগ্রহী, তাদের আইওএমের সহযোগিতায় দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

এদিকে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধিদল লিবিয়ার গাদামেস শহরের কাছে একটি আটককেন্দ্রে থাকা বাংলাদেশিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তাদের কাউন্সেলিং করেছে। লিবিয়া অবজারভার জানায়, চলতি বছর দেশটির কোস্টগার্ড সমুদ্র থেকে ৯ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০২০ সালে উদ্ধার করা হয় সাত হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশীকে। অর্থাৎ সংখ্যা বাড়ছে। ঐ বছর এক সন্ত্রাসী ঘটনায় লিবিয়া ২৬ বাংলাদেশীকে হত্যা করার ঘটনাও বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল।

উল্লেখ্য, ইউরোপে অবৈধ পথে ঢুকতে চাওয়ার একটা বড় কারণ সেখানকার দেশগুলোতে, বিশেষত ইতালিতে শ্রমশক্তির যথেষ্ট চাহিদা থাকা। অনেকেই বলছেন, শ্রমিকদের বৈধভাবে সেখানে যাওয়ার সুযোগ করে দিলে পাচার কম হতো। কিন্তু সেখানকার উদ্যোক্তারা স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাচ্ছেন বিধায় অবৈধ পথে অভিবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। সুতরাং, পাচার চক্রকে যেমন ধরতে হবে, তেমনি ইউরোপের এসব দেশ যাতে বৈধভাবে শ্রমশক্তি আমদানি করে সে জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

মহামারির ধাক্কায় কাজ হারিয়ে প্রবাসীদের একাংশ দেশে ফিরেছেন

সরকার ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করেছে

মহামারির দ্বিতীয় বছর ২০২১-এ দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ঢেউ'য়ের মাঝে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসা অব্যাহত ছিল। বিশেষ করে যেসব দেশ মহামারির কালে অর্থনৈতিকভাবে মন্দার কবলে পড়েছে সেসব দেশে বাংলাদেশী প্রবাসীরা অনেকেই চাকুরি হারায়, অনেকের বেতন কমে যায়, অনেককে মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে কোয়ারিন্টিনে থেকে দেশে ফিরে আসতে হয়। এরকম অনেকে দীর্ঘ সময় পর প্রস্তুতিহীনভাবে দেশে ফিরে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। কারণ দেশেও মহামারির একের পর এক ঢেউ চলছিল তখন।

প্রচারমাধ্যম এবং সরকারি সূত্র অনুযায়ী মহামারির কারণে দুই উপায়ে প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে ফিরেছেন। কেউ এসেছেন ভ্রমণের বৈধ পাস নিয়ে আর কেউ স্বাভাবিক পাসপোর্টে। এরকম সকলের নির্ভরযোগ্য হিসাব কোন দপ্তরে নেই। তবে পাসপোর্ট না থাকায় ভ্রমণ পাস বা আউট পাস নিয়ে দেশে আসাদের সংখ্যাগত একটা হিসাব পাওয়া যায় প্রবাসী কল্যাণ দপ্তরে। সেই তথ্যের উদ্বৃতি দিয়ে প্রথম আলো গত ১৯ জুন লিখেছে ২০২০ সালে আউটপাস নিয়ে দেশে ফিরেছেন ৬৩ হাজার ৪৩৯ প্রবাসী। আগের বছর ২০১৯ সালে ফিরে আসেন ৬৪ হাজার ৬৩৮ জন। ২০২১ সালেও এমন খালি হাতে ফিরে আসা থামছে না। ১৩ জুন পর্যন্ত দেশে ফিরেছেন ৩৬ হাজার ২১০ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফিরেছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে। এর আগে ২০১৬ সালে ৪১ হাজার ৬২৬ জন, ২০১৭ সালে ৫০ হাজার ১৬৩ জন ও ২০১৮ সালে ৬৮ হাজার ৮১২ জন ফিরে আসেন আউটপাস নিয়ে।

এই ফিরে আসাদের বিদেশ যাওয়ার কাহিনী সকলের একরকম নয়। অনেকে মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিদেশ যেয়ে প্রতারিত হয়েছেন। নির্ধারিত কাজ পাননি। কেউ কেউ কর্মস্থল বদল করে অবৈধ হয়েছেন। কেউ অন্য কোন কারণে আটক হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় দেশে চলে এসেছেন।

এ বিষয়ে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন ১৯ জুন প্রথম আলোকে বলেন, বৈধ পথে বিদেশে গেলে এসব কমে আসবে। তাই নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। তবে যাঁরা আউটপাস নিয়ে আসেন, তাঁরা সবাই শূন্য হাতে ফেরেন না। করোনার প্রভাবে কারও কারও আর্থিক দুর্দশা অবশ্য বেড়েছে। দেশে ফেরা সবাইকে সহায়তার চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে লেবানন থেকে বেশ বড় সংখ্যায় শ্রমিক দেশে ফিরতে বাধ্য হয় সেখানকার দীর্ঘ মন্দার কারণে। মন্দায় দেশটির মুদ্রার মান অবিশ্বাস্য রকমে পড়ে যায়। এতে সেখানে কর্মরত বাংলাদেশীরা তাদের আয় ডলারে রূপান্তর করতে যেয়ে ঠকছিল।

তৃণমূল অভিবাসীদের সংগঠন অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রামের (ওকাপ) চেয়ারম্যান শাকিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেছেন, বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে এজেন্সির ভিসা বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। যাঁরা নানা

কারণে বিদেশে গিয়ে অনিবন্ধিত হয়ে পড়েন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে বৈধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

অভিবাসন খাতের উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তারা বলছেন, কর্মী পাঠানো নিয়ে সবাই কাজ করে। কিন্তু ফিরে আসা কর্মীদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে দেশে তেমন কোনো কাজ হয় না। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনসহ কিছু দেশ অনেক আগে থেকে এটি শুরু করেছে। শুধু সরকার নয়, সবার এদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

উল্লেখ্য, মহামারিতে অনেক প্রবাসীকে যেমন বিড়ম্বিত হয়ে দেশে ফিরতে হয় তেমনি দেশ থেকে বৈধ কাগজপত্র নিয়ে বিদেশে কাজে যাওয়ারাও অনেক দেশে কোয়ারেন্টিন সংক্রান্ত নিয়মকানুনের বিড়ম্বনায় পড়েন। ২০২০ সালে মহামারির কারণে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশের জন্য যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা থেকে উত্তরণে সরকার নানান উদ্যোগ নিলেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের কঠোর নিয়ম কানুনে এসব উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলো। যেমন সৌদি আরব ২০২১-এ এক পর্যায়ে নিয়ম করে করোনার দুই ডোজ টিকা নেওয়ার পর ১৪ দিন অতিবাহিত করেছেন এমন শ্রমিকরা সৌদিতে যেতে পারবেন। যারা করোনার টিকা গ্রহণ করেননি তাদের সেখানে যাওয়ার পর সাত দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। এ জন্য তাদের অতিরিক্ত ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হবে। বাংলাদেশ টিকার ধীর লয়ের আমদানির কারণে গ্রাম পর্যায়ে খুব কমজনকে টিকা দিতে পেরেছে। সচরাচর গ্রামীণ জনপদের বেকারদের মাঝেই বিদেশে চাকুরি নিয়ে যেতে আগ্রহ বেশি থাকে।

সরকারের ঋণ সহায়তা

২০২১ সালে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের পুনর্বাসনে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করে সরকার। এই তহবিল থেকে চার শতাংশ সুদে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রবাসী শ্রমিকদের বড় একটি অংশ এই ঋণসুবিধা সম্পর্কে জানেন না। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সারা দেশে এই ব্যাংকের শাখা মাত্র ৬৬। বিদেশফেরত শ্রমিকদের ঋণসুবিধা দিতে হলে অন্যান্য ব্যাংকের সহায়তাও নেয়া দরকার। সুদের হার কমানোরও দাবি উঠেছে। বিদ্যমান প্রণোদনা মূলত ব্যাংকিং চ্যানেল ও শর্তভিত্তিক ঋণ হওয়ায় অনেকেই এই সুবিধা নিতে পারছেন না। প্রণোদনার অর্থ ছাড়ে জটিলতা দূর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শর্ত পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোও জরুরি।

এদিকে ১৯ এপ্রিল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. নাজীবুল ইসলাম ডেইলি স্টারের প্রতিবেদককে বলেছেন, তাঁদের মন্ত্রণালয় প্রত্যাগত প্রবাসী শ্রমিকদের আরপিএল (রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং) বা অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি সনদ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে। আরপিএল সনদ পেলে একজন ফিরে আসা প্রবাসী শ্রমিক অভ্যন্তরীণ বাজারে চাকরি পেতে পারবেন এবং একই সঙ্গে এটি তাকে পুনরায় বিদেশে ফিরে যেতেও সাহায্য করতে পারবে। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, তাদের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে দুই হাজার প্রত্যাগত শ্রমিককে আরপিএল সনদ দেওয়া। তবে প্রবাসী শ্রমিকদের সাড়া দেওয়ার পরিমাণ অনুসারে এ সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে, জানান তিনি।

২০২১-এর ১৮ ডিসেম্বর প্রথম আলোর প্রতিবেদনে জানা যায়, দেশ থেকে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা ২০২০ এর চেয়ে বিপুলভাবে বেড়ে গেছে পরের বছর। ২০২১-এর ১১ মাসে বিদেশে গেছে ২১৭৪৬৯ জন কর্মী।

চা শিল্পে মজুরি অসন্তোষের সঙ্গে ছিল করোনাভীতি ও ঝুঁকি

অথচ উৎপাদনে রেকর্ড

২০২১ সালের ১৩ জুন চা খাতে শ্রমিক মজুরির নতুন খসড়া কাঠামোর সুপারিশের প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল। এই মজুরি কাঠামোর সুপারিশ পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিল শ্রমিকরা তখন। অনেক শ্রমিক প্রচারমাধ্যমকে এও জানায়, এতে কার্যত তাদের মজুরি কমবে– বাড়বে না।

চা শ্রমিকরা ২০১৮-১৯-এর চুক্তির আলোকে ২০১৯ সাল থেকে দৈনিক যে হারে মজুরি পেয়ে আসছিল ২০২১ সালের নতুন মজুরি কাঠামোতেও ঐ পরিমাণ টাকাই মজুরি হিসেবে সুপারিশ করতে দেখা যায়। প্রস্তাবিত সুপারিশে এ ক্যাটাগরির বাগানগুলোর শ্রমিকদের জন্য রাখা হয় ১২০ টাকা মজুরি। বি ক্যাটাগরির জন্য ১১৮ টাকা; সি ক্যাটাগরির জন্য ১১৭ টাকা। এর বাইরে চা শ্রমিকরা বরাবরই ভর্তুক্তি দামে কিছু চাল বা আটা পেয়ে থাকে। নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকর হলে এবং সর্বশেষ বছরের মূল্যস্ফীতিকে বিবেচনায় নিলে কার্যত শ্রমিক মজুরি না বাড়ারই কথা।

মজুরি সংক্রান্ত এরকম সুপারিশের পাশাপাশি আলোচ্য গেজেট বিজ্ঞপ্তির সুপারিশের ৭নং ধারায় বলা আছে চা শিল্পের বহু বছরের প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশ চা সংসদ প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর মজুরি ছাড়াও উৎপাদনশীলতা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রকৃতপক্ষে চা শিল্পের বহু বছরের প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো শ্রমিক ও মালিকপক্ষ প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর আলোচনা করে সমোঝোতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ৩ (তিন) বছর অন্তর অন্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণের (চুক্তির) বিষয়টি তাই শ্রমিকদের বিস্মিত করেছে। এটা দীর্ঘমেয়াদে তাদের নতুন মজুরি প্রাপ্তিকে ২ বছরের জায়গায় ৩ বছরে দীর্ঘায়িত করবে; মুদ্রাস্ফীতির বিবেচনায় এতে প্রকৃত মজুরি কমে যাবে।

অতিমারিরকালে ২০২১-এর জুনে চা শ্রমিকদের জন্য যে নতুন মজুরি কাঠামো গেজেট আকারে প্রস্তাব করা হয় এবং সেটা যে মজুরি বোর্ড করেছে সেই বোর্ড গঠিত হয়েছে দীর্ঘ অনেক বছর পর ২০১৯-এর অক্টোবরে। অথচ প্রতি পাঁচ বছর পরপর মজুরী বোর্ড গঠন করে চা শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ করার কথা। বিশেষ করে ২০১৯-২০-এর চুক্তির মেয়াদ ২০২০ সালের ডিসেম্বরেই তামাদি হয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং ২০২১-এর জানুয়ারি থেকে চা খাতের শ্রমিকরা নতুন বর্ধিত মজুরি কাঠামো আশা করছিল।

আলোচ্য এই গেজেটে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার চা বাগানগুলোকে এ, বি এবং সি শ্রেণিতে এবং চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও অন্যান্য জেলার চা বাগানকে উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ

করে মজুরি প্রস্তাব করে। বছরে ১ লাখ ৮০ হাজার কেজি বা তারচে বেশি চা উৎপাদন করে এমন বাগান এ শ্রেণি এবং ১ লাখ ৮ হাজার কেজির কম উৎপাদন করা চা বাগানগুলোকে ধরা হয়েছে সি শ্রেণির বাগান ধরা হয়। মাঝের সব বি-শ্রেণিভুক্ত।

বিভিন্ন ক্যাটাগরির শ্রমিকদের পাশাপাশি চা বাগানে জড়িত কর্মচারিদের জন্যও নতুন মজুরী প্রস্তাব এসেছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান, নিরপেক্ষ সদস্য, মালিকগণের প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধিসহ মোট ছয়জনের স্বাক্ষর গেজেটে আছে। কেবল চা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী রামভজন কৈরী গেজেটে স্বাক্ষর দেয়া থেকে বিরত ছিলেন। বলা হয়েছে, গেজেট প্রকাশের চৌদ্দ দিনের ভেতর কোনো আপত্তি বা সুপারিশ থাকলে লিখিতভাবে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর পাঠাতে হবে। আপত্তি বা সুপারিশ আমলে নিয়ে সরকারের কাছে বিবেচনার জন্য মজুরি দাবি পেশ করবে মজুরী বোর্ড।

চা বাগানে করোনাকালীন সংকট

মজুরি বঞ্চনা ছাড়াও চা শ্রমিকরা করোনার দিনগুলোতে কাজের পরিবেশে নিয়েও সমস্যায় পড়েছিল গত বছর। করোনা মহামারিতে দেশ-দুনিয়া লকডাউন থাকলেও কাজ করতে হয়েছে চা বাগানের শ্রমিকদের। চা শ্রমিক সংগঠন ২০২০ সালের ২৬ মার্চ বাগান মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ চা সংসদে' চিঠি দিয়ে ৪ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছুটির দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু বাগান মালিকরা সেই দাবি শোনেনি। অথচ ২০২০ সালের এপ্রিলে হবিগঞ্জের চন্ডীছড়া চা বাগানে ক্যান্সার আক্রান্ত এক শিশু মারা যাওয়ার পর পরীক্ষায় দেখা যার তার করোনা পজিটিভ ছিল। পরে ঐ বাগানের চা শ্রমিকদের ১২টি ঘর লকডাউন করা হয়। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের কালীঘাট চা বাগানের মন্টু তাঁতির করোনা শণাক্ত হয় ২১ এপ্রিল ২০২১। তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়ে তার অবস্থা খারাপ হলে হাসপাতালে নেয়ার জন্য একটা এম্বুলেন্স চেয়ে চা শ্রমিকেরা বাগান কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘসময় অনুরোধ করে। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ এম্বুলেন্সটি না দিলে শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শহর থেকে চা বাগানে এম্বুলেন্স পাঠিয়ে রোগীকে এনে মৌলভীবাজার হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন মন্টু তাঁতি করোনায় মারা যান।

এভাবে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণ এবং অতিমারীর জটিল সময়েও চা-উৎপাদন বন্ধ করেনি শ্রমিকেরা। বলা যায় দেশের অর্থনীতির এই খাত সচল রেখেছে তারা।

অসুখ ও চিকিৎসাহীনতায় মৃত্যু চা বাগানে এমনিতেও পুরানো কাহিনী। কলেরা, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, হাম লেগেই থাকে।

জাতীয় আয় বাড়ছে, কিন্তু চা শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না

সরকারি হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বতন্ত্রভাবে আয় ছিল ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার বা প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। ২০০৫-২০০৬ সালে এটা ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ গত ১৩-১৪ বছরে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। কিন্তু ১৩-১৪ বছর আগে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল প্রায় ৩০ টাকা আর বর্তমানে ১১৭ থেকে ১২০ টাকা প্রস্তাব করেছে নিম্নতম মজুরী বোর্ড। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের হিসাব ধরলে একজন চা শ্রমিকের মাসিক মজুরি মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকা হয় এবং বছরে তা দাঁড়ায় মাত্র ৪২ হাজার ১২০ টাকা। সেটা অবশ্যই এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকার অনেক অনেক কম। এরকম অবস্থায় ২০২১-এর নিম্নতম মজুরী বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিলে, উন্নয়নের পরিভাষায় চা শ্রমিকরা 'গরিব' ও

> মজুরি বঞ্চনা ছাড়াও চা শ্রমিকরা করোনার দিনগুলোতে কাজের পরিবেশে নিয়েও সমস্যায় পড়েছিল গত বছর। করোনা মহামারিতে দেশ-দুনিয়া লকডাউন থাকলেও স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে হয়েছে চা বাগানের শ্রমিকদের

'প্রান্তিক'ই থেকে যাবে। চা বাগানের দশ লাখ মানুষকে উন্নয়নের মূলধারায় আর যুক্ত করা হবে না।

বাংলাদেশের চা উন্নয়ন বোর্ডের হিসাবে দেশে চা বাগান ১৬৭টি। আবার চা উৎপাদনও চলছে ১৬৭ বছর ধরে। এত বছর পরেও চা শ্রমিকের মজুরি ১৬৭ টাকাও হয়নি।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের হিসাব অনুযায়ী, মজুরির পাশাপাশি কম দামে নির্ধারিত কয়েক কেজি চাল বা আটার যে সুবিধা একজন চা শ্রমিক পায় তাতে দিনের হিসাবে তাদের মজুরি ২০০ টাকা হতে পারে। অর্থাৎ মাসে ছয় হাজার টাকা। এই আয়ে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণ অসম্ভব।

চা শ্রমিক ইউনিয়নের তথ্যমতে নিবন্ধিত চা শ্রমিক প্রায় ১ লাখ ১৭ হাজার এবং অনিবন্ধিত শ্রমিক আছে আরো প্রায় ২৫ হাজার। এছাড়াও চা বাগানে বসবাস করছেন আরও প্রায় কয়েক লাখ মানুষ। ইতিহাসে বহু আন্দোলন সংগ্রামের পরও বিপন্ন এই জনগোষ্ঠী আজও দারিদ্র্য সীমার বাইরে আসার মতো মজুরি সুবিধা পাচ্ছে না। বাগানগুলোতে নতুন প্রজন্মের কম জনই নতুন করে চাকুরি পাচ্ছে। ফলে খুবই বেকারত্ব সেখানে। আবার কেউ চাকুরি পেলেও সেই আয়ে একটা সংসার চালানো কঠিন।

নিম্নতম মজুরী বোর্ডকর্তৃক ঘোষিত ৪৩টি সেক্টরে এবং মজুরী কমিশন ঘোষিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরের মজুরীর ভেতর তুলনা করে অনেকে গতবছর এও দেখিয়েছেন চা শ্রমিকের মজুরী তুলনামূলকভাবে খুব কম। উপরন্তু করোনার মাঝেও ২০২০ সালে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক কোটি চার লাখ পঞ্চাশ হাজার কেজি চা বেশি উৎপাদন করেও তারা মজুরির অংকে তার প্রতিফলন দেখতে পেলো না। এমনকি ২০২১ সালেও চায়ের উৎপাদন বেড়েছে বলে জানাচ্ছে ৩১ অক্টোবরের ডেইলী স্টার। ঐ প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের চেয়ে গত বছরের সেপ্টেম্বরে এক কোটি ২২ লাখ কেজি চা বেশি উৎপাদিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে দেশে এ বছর ১০ কোটি কেজি চা পাওয়া যাবে। যা হবে এক রেকর্ড। চায়ের দামও ক্রমাগত বাড়ছে বলে দেখিয়েছে আলোচ্য প্রতিবেদন।

শ্রমিকদের হাত ধরেই চা উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে নবম স্থান অর্জন করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, করোনা মহামারীর ভেতরেও যারা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি উৎপাদন করলো তাদের মজুরি প্রশ্নটি আরও উদার বিবেচনা দাবি করে কি না? সেক্ষেত্রে চা খাতের শ্রমিকরা গত বছর দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির যে দাবি তুলেছেন তা বিবেচনার দাবি রাখে বৈকি। উল্লেখ্য, মজুরির উপরোক্ত সুপারিশ সত্ত্বেও সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ই শেষ পর্যন্ত মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মজুরি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখে এবং সরকার যেকোন সময় চা খাতের মজুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে সুনজর দিবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

উল্লেখ্য, ভর্তুকি দামের রেশনের পাশাপাশি চা-বাগান মালিকেরা ঘর ভাড়া, চা-পাতা তোলার বিভিন্ন সরঞ্জাম, অতিরিক্ত সময়ের মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ডে মালিকদের অনুদান, চিকিৎসা ব্যয়, পেনশন, শ্রমিক পরিবারের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্যে ব্যয়, শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচির খরচ, এমনকি সরকারের কাছে থেকে চা-বাগানের জন্যে লিজ নেয়া জায়গায় শ্রমিকরা যে শাকসবজি, ফলমূলের সেটাকেও মজুরির হিসাবে যুক্ত করার চেষ্টা করছে অনেক দিন ধরে। তারা উৎসব ভাতাও কমাতে চায়। অনেক গবেষক দাবি করেছেন চা-শ্রমিকরা কতটুকু মজুরি পাওয়া উচিত, তা সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্যে অর্থনীতিবিদদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে একটা সঠিক সুপারিশ বেরিয়ে আসতে পারে। তবে এর পাশাপাশি এই খাতের শ্রমিকদের জাতীয় পর্যায়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। কেবল তাদের লক্ষ্য করে এরকম কিছু কর্মসূচি থাকা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, শ্রমিকদের অবস্থার বড় ধরনের কোন পরিবর্তন না ঘটলেও বাংলাদেশ বর্তমানে চা উৎপাদন ও গুণগত মান উভয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতার পর দেশের চা উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালে দেশের মোট চা উৎপাদন ছিল ২৩.৪৮ মিলিয়ন কেজি, যা ২০১৯ সালে রেকর্ড পরিমাণ ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীত হয় এবং আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে ২০২০ সালে ৮৬.৩৯ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে ৫০ বছর ব্যবধানে দেশের মোট চা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০ শতাংশ।

চামড়া শিল্পখাতে অনিশ্চয়তার প্রত্যাবর্তন

শ্রমিক নেতারা যে বিপদের কথা বলেছিলেন তাই হলো এ খাতে ২০২১ সালে। দূষণ কমাতে না পেরে ইমেজ সংকট এবং হুমকির মুখে কেন্দ্রীয় চামড়া শিল্পনগরী

চামড়া শিল্পখাতে ২০২১ সালে বড় আকারে বিতর্ক উঠে পুরানো সমস্যা দূষণ নিয়ে। অব্যাহত দূষণের কারণ সাভারে এই শিল্পের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রটি বন্ধের সুপারিশ আসে গুরুত্বপূর্ণ এক সংসদীয় কমিটির কাছ থেকে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাত চামড়া। প্রায় দুই শতাধিক ট্যানারি রয়েছে দেশে। ২০২১-এর এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১০ মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৭৬ কোটি ডলার আয় করেছে। তবে প্রত্যাশিত সম্ভাবনার চেয়ে এটা বেশী নয়। অতীতে এ খাত থেকে ১২৩ কোটি ডলার পর্যন্ত বাৎসরিক রপ্তানি আয়ের রেকর্ড আছে। বলা যায় বাংলাদেশের এই খাত এখন তার পুরানো সফলতার পেছনে পড়ে গেছে।

মাত্র কয়েক বছর আগে এখাতের কেন্দ্রীয় শিল্পনগরী ঢাকার হাজারিবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তর হয় ঢাকাবাসী ও বুড়িগঙ্গা নদীকে দূষণের হাত থেকে রেহাই দিতে। কিন্তু সাভার যেয়ে স্থানীয় নদীপ্রবাহ দূষণ করতে শুরু করে এই খাতের বর্জ্য। দীর্ঘসময় পরও মালিক গোষ্ঠী এবং সরকার সেখানে বর্জ্য নিষ্কাশনের মানসম্মত ব্যবস্থা না করায় স্থানীয় নদী ও জলাশয় মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়তে থাকে ক্রমাগত। এতে আবারও ২০২১ সালে সাভার থেকে চামড়া কারখানা সরানোর প্রসঙ্গ জাতীয় আলোচনায় আসে। সেই আলোচনা ও বিতর্কের পটভূমিতেই ২০২১-এর আগস্টে সাভারের চামড়া শিল্পনগরী আপাতত বন্ধ রাখতে সুপারিশ করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। চামড়ার কারখানাগুলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে না করায় কমিটি থেকে এই সুপারিশ করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে দ্রুত সময়ের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনকে (বিসিক) এ বিষয়ে চিঠি দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে চামড়া শিল্পনগরী পরিদর্শন করে সার্বিক অবস্থা দেখে এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে সংসদীয় কমিটি বলেছে, পরিবেশ দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার পর আবার চালু করা যাবে সাভারের চামড়া শিল্পনগরী। সংসদীয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জানায়, সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে দৈনিক ৪০ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য উৎপাদন হয়। যেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা আছে মাত্র ২৫ হাজার ঘনমিটার। দৈনিক ১৫ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য পরিবেশে মিশছে সেখানে। এ হিসাবে গত তিন বছরে এক কোটি

৬৪ লাখ ঘনমিটার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাইরে থকে গেছে। অর্থাৎ এসব বর্জ্য সাভার ও আশেপাশের প্রকৃতিতে মিশে গেছে। বলাবাহুল্য, এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এক তথ্য। স্বভাবত জাতীয় পরিসরে এই সংবাদ ব্যাপক আলোড়ন তোলে। সরেজমিন অনুসন্ধানে হেমায়েতপুরে কথিত এই শিল্পনগরীর ভেতরই রাস্তার আশেপাশে অনেক বর্জ্য লক্ষ্য করা গেছে। শ্রমিকরা হাত পা ও মুখে কোন সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই এসব বর্জ্য পরিবহন করছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটির উপরোক্ত অভিমতের আলোকে ইতোমধ্যে বিসিক চেয়ারম্যানকে চামড়া শিল্পনগরীর দূষণ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলেছে। বিসিক হলো চামড়া শিল্প নগরী বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত উল্ল্যাহ ২৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক প্রথম আলোতে লিখেছেন, চামড়া শিল্পনগর বন্ধ করে দেওয়া হলে চামড়া আমদানি করতে হবে দেশকে। তাতে স্থানীয় বাজার সমস্যায় পড়বে। চামড়া শিল্পনগর বন্ধ করে দেওয়া সমাধান নয়, বরং অপরিশোধিত বর্জ্য কিছুতেই যাতে ধলেশ্বরী নদীতে না যায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। আমরা চাই না অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে পড়ুক। তিনি আরও বলেন, সাভার চামড়া শিল্পনগরের কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের (সিইটিপি) কাজ পুরোপুরি শেষ না করেই আমাদের অনেকটা টানাহেঁচড়া করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে পরিবেশবান্ধব পরিবেশে পণ্য উৎপাদিত হবে– এটাই ছিল মূল লক্ষ্য এবং সবার প্রত্যাশা। কিন্তু চার বছরেও চামড়াশিল্প ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। নতুন বাজারও সৃষ্টি হয়নি। চার বছর ধরে চামড়ার বাজার নিম্নমুখী।

উল্লেখ্য, চামড়া শিল্পের দূষণ বন্ধে মালিকদের দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার জন্য এই খাতের শ্রমিক নেতারা দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছিলেন। তাঁরা বলতেন, পরিবেশসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম করা না গেলে এই খাতের বিকাশ আটকে যাবে। বৈশ্বিক বাজার বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সরকার বা মালিকদের সংগঠন শ্রমিক নেতাদের এসব বক্তব্যে সময় মতো মনযোগী না হওয়ায় ২০২১-এর সর্বশেষ পরিস্থিতির উদয় হলো।

উল্লেখ্য, চামড়া শিল্পনগরী হাজারিবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তরে সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছিল শ্রমজীবীরা। কারণ ঢাকার হাজারিবাগ থেকে তাদের সাভারে যেয়ে কাজ করা কঠিন ছিল। তখন সকল মহল থেকে পরিবেশ প্রশ্নে কষ্ট সহ্য করার জন্য বলা হয় তাদের। অথচ সর্বশেষ অবস্থা বলছে, পরিবেশ প্রশ্নে এ খাতে কোন উন্নয়ন বা অগ্রগতি হয়নি– কেবল শ্রমিকদের অপূরণীয় ক্ষতি মেনে নিতে হয়েছে বিগত সময়ে।

সর্বশেষ ঘটনায় ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ২০২১-এর ২৫ আগস্ট বিবৃতি দিয়ে বলেছে, কী কারণে এবং কাদের অবহেলায় চামড়া খাত থেকে দূষণ হচ্ছে তা অনুসন্ধান করে প্রতিকার করাই সমস্যা সমাধানের পথ। তার পরিবর্তে শিল্পনগরী বন্ধের সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য, বরং সংসদীয় কমিটির উচিত এখাতের পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর পূর্বাপর খতিয়ে দেখে সেগুলো সমাধানের পথনির্দেশ দেয়া।

এদিকে, সাভারে চামড়া শিল্পনগরীর পাশের এলাকা হেমায়েতপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চামড়াশিল্পের কারণে ধলেশ্বরীতে আগের মতো মাছ মিলছে না। একসময় এই নদীর পানি দিয়ে ভাত রান্না করা হতো, অথচ এখন গোসলও করা যায় না। এমনকি হাত-পা ধুলেও চুলকানি শুরু হয়ে যায়।

পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী গড়ার প্রকল্পটি নেয়া হয় ২০০৩ সালে। ছয় গুণ ব্যয় বাড়িয়ে দুই বছর মেয়াদী প্রকল্পটি ১৯ বছর ধরে বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২০২১ সমাপ্তি ঘোষণা হয়। কিন্তু সমাপ্তি ঘোষণার পরও কথিত শিল্পনগরী থেকে যায় 'অসম্পূর্ণ ও পরিবেশ-অবান্ধব'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচ্য এই প্রকল্পে ১৭৫ কোটি টাকার পরিবর্তে ১০১৫ কোটি খরচ হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণ বন্ধে 'কমন ক্রোম রিকভারি ইউনিট নির্মাণ' সম্পন্ন হয়নি।

প্রকল্পের আওতায় দুই বছরের মধ্যে সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) স্থাপন করার কথা থাকলেও তা শেষ হতে লেগেছে সাত বছরেরও বেশি সময়। আবার, সেই সিইটিপির পরিশোধন ক্ষমতা পিক সিজনে ট্যানারিগুলোর উৎপাদিত বর্জ্যের মাত্র অর্ধেক। তাই সিইটিপিতে বর্জ্য পুরোপুরি ট্রিটমেন্ট হওয়ার আগেই তা ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে, হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো যেভাবে বুড়িগঙ্গার পানিকে বিষে পরিণত করছিল, সেই ভাগ্য বরণ করতে হচ্ছে এককালের টলমলে স্বচ্ছ পানির ধলেশ্বরীকে। এসব ব্যর্থতা আড়াল করে এখন শিল্পনগরী বন্ধ ও স্থানান্তরের কথা যখন উঠেছে তখন কেউই বলছে না ব্যর্থতাটা কার এবং এ শিল্প বন্ধ হলে কাঁচামালের যোগানদাতা, শিল্পে ব্যবহৃত নানান রাসায়নিকের যোগানদাতা এবং এ খাতের শ্রমিকদের কী হবে। ইতোমধ্যে যারা হাজারিবাগ থেকে একবার উৎখাত হয়ে সাভারে এসেছে সেই মানুষগুলো কী করবে? কার দোষে তাদের বারবার পরিবার পরিজন নিয়ে বিপদে পড়তে হচ্ছে এবং হয়?

কয়লা শ্রমিকদের ঝুঁকি ভরা জীবন

[বাংলাদেশের খুব কম আলোচিত শ্রমজীবী তাঁরা। এ বিষয়ে প্রথম আলোর এই প্রতিবেদনটি তাই খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো এই শ্রমিকদের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি এবং করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে। প্রতিবেদনটি করেন আহমদুল হাসান ২০২১-এর ৪ নভেম্বর। কয়লা শ্রমিকদের কাজের দুঃসহ পরিবেশ নিয়ে রাজধানীর জনসমাজে কথাবার্তা তেমন শোনা যায় না।]

বিশাল রাজধানী ঢাকার লাগোয়া জায়গা সাভারের আমিন বাজার। এখানকার বড়দেশি গ্রাম ঘেঁষে প্রতিদিন চলছে জাহাজ থেকে কয়লা নামানোর কাজ। শত শত শ্রমিক কাজ করছে এখানে।

সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল– এই সাত মাস গাবতলী ও আমিনবাজারে তুরাগ নদের চারটি ঘাটে (দ্বীপনগর, কেবলারচর, কোরিয়ান ও নামার ঘাট) জাহাজ থেকে কয়লা নামানো হয়। এই কয়লা যায় ঢাকা ও পাশের জেলাগুলোর ইটভাটায়। এই কয়লা জাহাজ থেকে নামিয়ে ট্রাকে তোলার কাজে প্রায় ১০ হাজার মানুষ যুক্ত। তাঁদের অধিকাংশ এপ্রিলের শেষে গ্রামে ফিরে যান।

এ কাজে যুক্ত অধিকাংশ শ্রমিকই জানেন না এতে বিশেষ কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে কি না। এ রকম কিছু শোনেননি তাঁরা। খাটুনি এখানে হাড়ভাঙ্গা। দিনশেষে শরীর আর চলতে চায় না কারোই। খোঁজও নেয় না কেউ তাদের। আদিম এক পরিস্থিতি বলা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কয়লা শ্রমিকদের শরীরে তিনভাবে ক্ষতিকর ধুলো প্রবেশ করে। বিশেষ ধরনের মাস্ক ব্যবহার না করায় সরাসরি মুখ দিয়ে ঢুকছে ধূলো। এ ছাড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে এবং লোমকূপের ভেতর দিয়েও শরীরে সেটা প্রবেশ করছে। এতে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্য পড়ছে শ্রমিকরা। শ্বাসকষ্টসহ ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি পর্যন্ত রয়েছে সকলের। সরেজমিনে কয়লা শ্রমিকদের কোনো ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে দেখা যায়নি।

অন্যান্য দিনমজুরির চেয়ে জাহাজ থেকে কয়লা নামানোর কাজে একটু বেশি আয় হয়। সেই কারণে শ্রমিকেরা এই মৌসুমে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ঢাকায় আসেন এ কাজে। যাঁরা পরিবার নিয়ে আসেন, তাঁরা আমিনবাজার ও গাবতলীর আশপাশের নিম্নাঞ্চলে কম টাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন। অধিকাংশের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না। যেসব শ্রমিক একা আসেন, তাঁরা থাকেন শ্রমিক সরদারদের তৈরি করা অস্থায়ী মেসে।

ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোয় প্রায় সাড়ে চার হাজার ইটভাটা আছে। এসব ইটভাটার চাহিদা মেটে গাবতলীতে আসা কয়লায়। প্রতি ইটভাটায় এক রাউন্ডে বা একবারে প্রায় ৮ লাখ ইট পোড়ানো হয়। এতে লাগে ১৫০ মেট্রিক টন কয়লা। প্রতি মৌসুমে গড়ে ৮ রাউন্ড ইট পোড়ানো হয় একটি ভাটায়। এই হিসাবে একটি ইটভাটায় কয়লা লাগে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন। সাড়ে চার হাজার ইটভাটার জন্য ৫৪ লাখ মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন হয়। এই কয়লার আমদানিমূল্য প্রায় ৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। প্রতিবছর কয়লা আমদানি বাড়ছে।

কয়লা শ্রমিকদের ন্যায় অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের দেখভালের জন্য সরকারের শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা আরো উন্নত করা দরকার।

কয়েকজন কয়লা শ্রমিক জানালেন, দুই কারণে তাঁরা সন্তানদের লেখাপড়ায় আগ্রহী নন। প্রথমত, অভাবের সংসার। তাঁরা চান, কিশোর বয়স থেকে সন্তানেরা কাজ করে পরিবারকে সহযোগিতা করবে। দ্বিতীয়ত, সাত মাস কর্মস্থলে এবং বাকি পাঁচ মাস গ্রামে থাকতে হয়। সন্তানকে কোথায় ভর্তি করাবেন।

এই শ্রমিকদের জীবনে সমস্যা আরও আছে। মূলত ইটভাটায় ইট তৈরিতে জ্বালানি হিসেবে বিটুমিনাস শ্রেণির কয়লা আসে গাবতলী ও আমিনবাজারে তুরাগ নদের ঘাটগুলোতে। ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকা থেকে এসব কয়লা আমদানি হয়।

গার্মেন্টসের বয়লার এবং কিছু কারখানার জ্বালানি হিসেবেও এর ব্যবহার আছে। তবে তা খুব কম। বর্ষা শুরু হলে ইটভাটাগুলো বন্ধ থাকে। তখন আমদানিও বন্ধ। শ্রমিকেদের কাজ থাকে না তখন।

ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোয় প্রায় সাড়ে চার হাজার ইটভাটা আছে। এসব ইটভাটার চাহিদা মেটে গাবতলীতে আসা কয়লায়। প্রতি ইটভাটায় এক রাউন্ডে বা একবারে প্রায় ৮ লাখ ইট পোড়ানো হয়। এতে লাগে ১৫০ মেট্রিক টন কয়লা। প্রতি মৌসুমে গড়ে ৮ রাউন্ড ইট পোড়ানো হয় একটি ভাটায়। এই হিসাবে একটি ইটভাটায় কয়লা লাগে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন। সাড়ে চার হাজার ইটভাটার জন্য ৫৪ লাখ মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন হয়। এই কয়লার আমদানিমূল্য প্রায় ৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। প্রতিবছর কয়লা আমদানি বাড়ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রথম আলোকে বলেছেন, কয়লা পুড়িয়ে ইট বানানো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। আমদানি করা নিম্নমানের কয়লা ইটভাটায় ব্যবহার হচ্ছে। এসব কয়লায় সালফারের পরিমাণ অনেক বেশি। সরকার বলছে, ইটভাটায় কয়লার ব্যবহার বন্ধ করবে, কিন্তু আমদানি বন্ধ করছে না। আবার স্বাস্থ্যঝুঁকির কথাও জানেন না অনেক শ্রমিক। এই শ্রমিকদের মাঝে আছেন অনেক নারীও।

কেবলারচর এলাকায় পঞ্চাশোর্ধ্ব আবদুল আজিজ বলছিলেন, তিনি এক মাস আগে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে এসেছেন। এক মাস কয়লার কাজ করার পর তাঁর নিশ্বাস নিতে কিছুটা কষ্ট হচ্ছে। আগে এ ধরনের সমস্যা ছিল না। তিনি গ্রামে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছেন। এরকম আরো কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা বলেন, কয়লার কাজে ঝুঁকির কথা তাঁদের কেউ কখনো বলেনি। অন্তত এক মৌসুমে (সাত মাস) কয়লার কাজ করেছেন, এমন আটজন শ্রমিক জানান, আগে তাঁদের শারীরিক কোনো সমস্যা না থাকলেও এখন কাশি হয়। কখনো কখনো নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসক কাজী সাইফুদ্দিন বেননূর প্রথম আলোকে বলেন, এ ধরনের ধূলিকণা শ্বাসের সঙ্গে ঢুকলে শ্বাসকষ্ট হওয়ার পাশাপাশি লিভার, কিডনি ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে, কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে। এখানে কাজে কর্মঘণ্টাও নির্দিষ্ট নেই।

বেশ কয়েকজন কয়লাশ্রমিক প্রথম আলোকে বলেন, ভোর পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তবে ঘণ্টা হিসাবে মজুরি পান না তাঁরা। এক টুকরি কয়লা নামালে একটি করে টোকেন পান। টোকেন জমা দিয়ে তিন টাকা পান। শ্রমিক সরদারের প্রতিনিধিরা এই টোকেন দেন। সারা দিন কাজ করলে একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ ৮০০ টাকার মতো আয় করতে পারেন।

কেবলারচরের শ্রমিক সরদার মজিবুর রহমান বলেন, এখানে কোনো শ্রমঘণ্টা নেই। টুকরি টানলে টাকা, না টানলে টাকা নেই।

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গৌতম কুমার প্রথম আলোকে বলেন, কয়লা ওঠানো-নামানোর কাজ খুবই অপরিচ্ছন্ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রমিক ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়নের আওতাভুক্ত হওয়া জরুরি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ আছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক হোক, শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রেড ইউনিয়নের আবেদন করতে পারবেন এবং সেটার অনুমোদনও দেওয়া হয়। এতে মালিকপক্ষের সঙ্গে তাঁরা দরকষাকষি করতে পারেন। ইউনিয়ন না থাকলে তাঁদের সেই সুযোগ সীমিত হয়ে আসে।

গাবতলী ও আমিনবাজার এলাকায় ৫০টির বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইটভাটায় কয়লা কেনাবেচা করে। তাদের একটি নূর এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী দেলোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কয়লা নামানোর কাজ করান শ্রমিক সরদারেরা। তাঁরাই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

এ বিষয়ে তিনজন শ্রমিক সরদারের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা বলেন, কয়লার কাজে স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি তাঁরা জানেন না। এ বিষয়ে তাঁদের কখনো কেউ কিছু বলেনি। এ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনাও নেই।

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, কয়লা এক ধরনের ব্ল্যাক কার্বন। এর সংস্পর্শে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের শরীরে তিন উপায়ে এই ডাস্ট প্রবেশ করে– নিশ্বাসের সঙ্গে, মুখ দিয়ে এবং লোমকূপ দিয়ে। এই কার্বন ফুসফুসে ইনফেকশন (সংক্রমণ) ঘটায়, যা শ্বাসকষ্টের অন্যতম কারণ। অনেক সময় রক্তে কার্বন মিশে ব্লাড ক্যানসারও হতে পারে। কয়লার সংস্পর্শে কয়েক বছর কাজ করলে শারীরিক সক্ষমতাও আর থাকে না। ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হওয়ায় কয়লা শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা দরকার।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম তামিম বলেন, সারা বিশ্বের কয়লা শ্রমিকেরা 'কোল ডাস্ট পয়জনিংয়ে'র শিকার হয়। ফুসফুসে ডাস্ট প্রবেশ করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়। ডাস্ট যেন শরীরে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য বিশেষ মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইক চালকদের
দেশব্যাপী আন্দোলন

২০২১ সালে বাংলাদেশে করোনার মাঝেও জুলাই-আগস্টে স্বল্পকালীন গুরুত্বপূর্ণ একটা রুটিরুজির আন্দোলন ছিল ব্যাটারি ও বিদ্যুতচালিত রিকশাজাতীয় যান চালকদের সংগ্রাম। যানগুলোর চলাচল নির্বিঘ্ন রাখার জন্য এই আন্দোলন গড়ে উঠে।

এই আন্দোলনের জন্ম ২০ জুনের এক সরকারি ঘোষণা থেকে। সড়ক পরিবহন বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের এক বৈঠক শেষে ২১ জুন ঘোষণা হয়, সরকার সারাদেশে ব্যাটারি রিকশা ও ভ্যান চলাচল বন্ধ এবং পর্যায়ক্রমে ইজিবাইক, নসিমন, করিমন ও ভটভটিকে বন্ধ করার বিষয় বিবেচনা করছে। তখন এও বলা হয় ব্যাটারি রিকশা ও ইজি বাইকের ব্রেক পদ্ধতি বা তার কাঠামোগত দুর্বলতা দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে নির্মাণ ত্রুটি রয়েছে। এগুলো খুচরা যন্ত্রাংশ হিসেবে আমদানি করে স্থানীয়ভাবে তৈরি হচ্ছে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত নজরদারি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই। সরকারি তরফ থেকে উপরোক্ত বক্তব্যের পাশাপাশি একই সময়ে ইজি বাইকের বিরুদ্ধে 'চার্জে'র নামে সম্মিলিতভাবে বিদ্যুত চুরির অভিযোগও প্রচার করা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রচারমাধ্যমে। এরপরই উপরোক্ত ধরনের যানবাহন চালক ও মালিকরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামে। প্রায় প্রতি জেলায় হাজার হাজার চালককে এই আন্দোলনে শামিল হতে দেখা যায়। আন্দোলনের চাপে বন্ধের পরিকল্পনা কিছুটা শ্লথ হয়ে যায়।

জনসংখ্যার বিচারে এই জনআন্দোলনে বহু মানুষের স্বার্থ জড়িত ছিল। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ২০-৩০ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক ও ভ্যান চলছে বলে অনুমান করা হয়। এই গাড়িগুলোর আয়ে সংসার চলছে আরও প্রায় দ্বিগুণ মানুষের। অনেক স্থানেই একটা গাড়ি দু বেলা দুজন চালক নেন। এসব গাড়ির জন্য প্রচুর মেকানিকের পেশা তৈরি হয়েছে। আবার এসব গাড়ী কেবল যাত্রীই পরিবহন করছে না, পণ্যও পরিবহন করছে। প্রান্তিক অঞ্চলে অর্থনীতিকে বাড়তি গতি দিয়েছে এসব যান। আবার বিদ্যুতচালিত বলে এসব পরিবহনের দ্বারা দূষণ কম ঘটছে। শিশু-কিশোরদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারেও এসব যানের প্রভাব রয়েছে। এসকল কারণ মিলে দ্রুতই যানগুলো জনপ্রিয় হয়েছে দেশব্যাপী।

করোনার মাঝে বহু মানুষ অন্যান্য পেশায় কর্মচ্যুতির শিকার হয়েও এরকম ব্যাটারিচালিত গাড়ি কিনে আয় রোজগারে টিকে থাকার চেষ্টায় ছিলেন এবং আছেন। ফলে দেশজুড়ে ইজি বাইকের সংখ্যা ২০২১ সালে দ্রুত বেড়ে গেছে।

ইজিবাইকের অর্থনীতি

দিনে গড়ে ৫০০ টাকা আয় করলেও লাখ লাখ ইজি বাইকের জাতীয় অর্থনীতিটি ইতোমধ্যে অনেক বড় আকার নিয়েছে। এর সাথে রিকশা মেরামত, রিকশার বডি তৈরি, টায়ার-টিউব, পার্টস উৎপাদন ও বিক্রি, ব্যাটারি উৎপাদন ও ব্যবসা, ব্যাটারি চার্জ ও বিদ্যুৎ ব্যবসা, ইজিবাইক বা এর যন্ত্রাংশ আমদানি, বিক্রি ও

দেশীয় উৎপাদন, গ্যারেজ নির্মাণ ও ভাড়া, খাবারের ব্যবসাসহ প্রায় ৪১ ধরনের কাজ ও পেশা যুক্ত আছে বলে জুন-জুলাইয়ের আন্দোলনকারীরা দাবি জানাচ্ছিলেন। আন্দোলনকারীরা এও বলেছে, তাদের যানবাহনের বিরুদ্ধে সরকারের নীতিগত অবস্থানে দেশের পরিবহন সেক্টরের মালিক-শ্রমিকদের সংগঠনগুলোর প্রভাব রয়েছে। বড় বড় পরিবহনের শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইজি বাইকধর্মী যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলেও তাদের অভিযোগ।

অন্যদিকে, নকশার ত্রুটি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল– বন্ধ না করে সরকার ও প্রকৌশলীদের সহায়তায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধী নকশার ব্যাটারিচালিত যানের ব্রেক তৈরি করা হলে তারা সেটা গ্রহণে প্রস্তুত আছে। এছাড়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তারা ইজিবাইকের সড়ক বান্ধব নকশা তৈরিরও আহ্বান জানায়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল, সরকার থেকে ত্রুটিপূর্ণ নকশার কারণে দুর্ঘটনা সৃষ্টির কথা বলে তাদের যানবাহন বন্ধের কথা বলা হলেও এসব চালক ও মালিকদের পুনর্বাসন বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হচ্ছে না। অথচ অনেক টাকা বিনিয়োগ করেই ইজিবাইক বা ব্যাটারিচালিত রিকশার মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে তারা।

বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে কিংবা এসব গাড়ির চালকদের পেশা পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত সময়, প্রশিক্ষণ ও সুযোগ না দিয়ে হুট করে ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ধ্বংস বা নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত বিবেচনাপ্রসূত হবে না। রাষ্ট্রের যেখানে সবার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের চেষ্টা করার কথা সেখানে লাখ লাখ মানুষের জীবন ও জীবিকার বাহন ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত তাদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার আয়োজন হয়ে দাঁড়াবে।

এরকম দাবিতে ব্যাটারি ও বিদ্যুতচালিত রিকসাধর্মী গাড়ির চালক ও মালিকরা জেলায় জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে সরকারকে স্মারকলিপি দেয় গত বছর। রিকসা, ব্যাটারি রিকসা ও ইজিবাইক চালকদের একটা সংগ্রাম পরিষদও গড়ে উঠে এই আন্দোলনের মাঝে। এই পরিষদ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে: ব্যাটারিচালিত গাড়ীগুলো রাস্তায় নামার সময় কেন বাধা দেয়া হয়নি, আর এখন শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়ে যাওয়ার পর কেন বাধা দেয়া হবে?

পরিষদের মতে, হাজার হাজার ব্যাটারিচালিত রিকশা একদিনে রাস্তায় নামেনি। কয়েক বছর ধরে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। চলাচলের অবাধ সুযোগ পেয়েই সেটা ঘটেছিল। বেশিরভাগ ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক মালিক এনজিও থেকে ৩০-৪০ হাজার টাকা লোন নিয়ে ব্যাটারি চালিত রিকশা-ভ্যান ও প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা লোন করে ইজিবাইক কিনেছেন। এখন গাড়ি চলাচল বন্ধ করা হলে চালক বা মালিকরা এনজিওর ঋণের টাকা ফেরত দেবে কীভাবে? তাছাড়া দুর্ঘটনাই যদি কোনও যানবাহন নিষিদ্ধের কারণ হয় তা হলে বাস, ট্রাক, সিএনজি অটোরিকশা, মোটরবাইক এসবও বন্ধ করার আওয়াজ উঠতে পারে। কারণ, ব্যাটারিচালিত রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইকের চেয়ে এসব যানবাহনের দুর্ঘটনার হার বেশি। আর এসব দুর্ঘটনা প্রাণঘাতীও বেশি।

এদিকে ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ নয় আধুনিকায়ন করে রিকশা, ভ্যান, ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান, প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে রিকশা, ইজিবাইকসহ স্বল্প গতির এবং জনগণের সীমিত গতির যানবাহন চলাচলের স্বার্থে পৃথক লেন, সার্ভিস রোড নির্মাণ করাসহ ৪ দফা দাবিতে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ২০২১-এর ২৫ সেপ্টেম্বর, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বড় আয়তনে এক রিকশা শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্যজীবীদের বিকল্প কাজের প্রশিক্ষণ জরুরি

বাংলাদেশের শহুরে শ্রমিক রাজনীতি বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামে মৎসজীবীরা সচরাচর দূরবর্তী এক চরিত্র। নদ-নদীময় বাংলাদেশে ক্রমহ্রাসমান হলেও এই পেশাজীবীরা এখনও বিপুল। অথচ তাদের পেশাগত সমস্যা-সংকট নিয়ে জাতীয়ভাবে আলাপ-আলোচনা কম। সর্বশেষ বছরে তার ব্যতিক্রম হিসেবে জেলে সমাজের কিছু সমস্যার কথা উঠে এসেছিল। বিশেষ করে ইলিশ আহরণকারী মৎস্যজীবীরা জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র হয়েও বহুবিধ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। এর নেতিবাচক অভিঘাত পড়ছে কথিত সমুদ্র-অর্থনীতিতে।

উল্লেখ্য, ইলিশ আহরণকারী দেশগুলোর মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। প্রায় পাঁচ লাখ জনশক্তি এখন সরাসরি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। আবার ইলিশের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ততার নিরিখে হিসাব করলে উপরোক্ত জনসংখ্যার আকার আরও বড়।

বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১১ ভাগ) এবং মোট জিডিপিতে তার অবদান ১ শতাংশ। ইলিশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আছে। মিয়ানমার, আরব সাগরসহ বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ ইলিশের। ইলিশ রক্ষার আঞ্চলিক উদ্যোগেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এসব অর্জন ধরে রাখতে এই খাতের মূল জনগোষ্ঠী হিসেবে মৎস আহরণকারীদের পেশাগত জীবনকে স্বচ্ছন্দ করা জরুরি।

সরকার বছরের বিভিন্ন সময় ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করার ফলে এই পেশাজীবীরা জীবিকার সংকটে পড়ছে। যদিও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতায় ইলিশ আহরণকারী জেলেদের তখন খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়– কিন্তু সেটাকে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো অপ্রতুল বলছে।

মাছ ধরা নিষিদ্ধের সময় ৪ লাখ মানুষ মাসিক ৪০ কেজি করে খাদ্যসহায়তা পাচ্ছে বর্তমানে। একসময় মাত্র ৬ হাজার ৯০০ মানুষ ১০ কেজি করে খাদ্যসহায়তা পেত। অর্থাৎ সরকারিভাবে মাছ আহরণ নিষিদ্ধের সময় কর্মহীনতা মোকাবেলায় ইতিবাচক চেষ্টা আছে।

কিন্তু এও মনে রাখতে হবে কর্মহীনতার সংকট কেবল কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়েই সমাধানযোগ্য নয়। যার কারণে সমুদ্রগামী জেলেদের ঋণগ্রস্ততা বর্তমানে একটা বড় সমস্যা হিসেবে হাজির হয়েছে। পাশাপাশি নারী জেলেদের স্বীকৃতির প্রশ্নও আজও যথাযথ মনযোগ পায়নি। এরকম নারী-পুরুষ সকলের জন্যই মৎসজীবী সমাজে দরকার এখন বিকল্প কাজের প্রশিক্ষণ এবং

ঋণসুবিধা। যাতে করে তারা মাছ আহরণের নিষিদ্ধ সময়ে আয় রোজগারের বিকল্প কাজ করতে পারে।

এদিকে, ২০২১-এর ১২ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দেশের কিছু স্থানে সরকারি নিষেধাজ্ঞার সময় প্রশাসনিক নির্দেশনা লঙ্ঘন করে মৎসজীবীরা ইলিশ শিকারের চেষ্টা করায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। জেলেদের এরকম সহিংস আচরণের মূলে রয়েছে একদিকে বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকাজনিত সংকট– আবার অন্য দিকে রয়েছে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালীর ইন্ধন।

মাছ ধরায় নানান সমস্যা

ইলিশ আহরণকারী মৎস্যজীবী সমাজের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ একটা সমস্যা হলো বাংলাদেশের জলসীমা থেকে ভারতীয় জেলেদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ এবং মাছ ধরে নেয়া। এটা পুরানো একটা সমস্যা। ফলে বাংলাদেশের জেলেরা কম মাছ পাচ্ছে। তাতে করে মাছ ধরার অভিযান থেকে তাদের বিনিয়োগের তুলনায় আয় হচ্ছে কম। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় জেলেদের অনুপ্রবেশের ঘটনা বঙ্গোপসাগরের গভীরে ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকায় সবচেয়ে বেশি। এলাকাটি মোংলা বন্দর থেকে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে। বাংলাদেশি জলসীমার ওই এলাকায় মাছের বেশি বিচরণ।

ভারতীয় জেলেদের এরকম অনুপ্রবেশ ও মাছ শিকারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানানো বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জেলেদের বক্তব্য হলো ঐ বিদেশীদের দৌরাত্ম্যে বাংলাদেশি জেলেরা কিছু এলাকায় মাছ শিকারে ক্রমাগত সমস্যায় পড়ছে। বাংলাদেশি জেলেদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে মাছ ধরতে বাধা দেন তারা। কখনো কখনো হামলাও চালায়।

ঠিক বিপরীত ধরনের আরেক সমস্যার মুখে পড়ছে টেকনাফ অঞ্চলের মৎস্যশিকারীরা। সেখানে মিয়ানমারের নৌবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশের জেলেরা মৎস আহরণে বাধা পায়। এমনকি অনেক সময় বাংলাদেশী জেলেদের বাংলাদেশ জলসীমা থেকে ধরেও নিয়ে যাওয়া হয়। ২০২১-এর নভেম্বরে এভাবে ২২ জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে কোস্টগার্ড উদ্যোগ নেয়ায় ১৩ ঘন্টা পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

কোস্টগার্ডের তৎপরতার কারণে দেশের অন্যতম মৎস আহরণ এলাকা সুন্দরবন অঞ্চলে এ বছর ডাকাতদের দৌরাত্ম অনুপস্থিত ছিল। তবে সেখানে ভিন্নরূপে প্রভাবশালীদের যন্ত্রণা বেড়েছে। বন বিভাগ থেকে মাছ ধরার অনুমতিপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভয়াবহ এক সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে দুবলার চরকে ঘিরে। এই সিন্ডিকেটের চরিত্রদের এখানে বলা হয় 'সাহেব'। ডেইলি স্টারের ১৬ নভেম্বরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, এই দ্বীপে ১৫ জন 'সাহেব' রয়েছেন। যারা সাধারণত বন বিভাগের কাছ থেকে মাছ ধরা মৌসুমে বনের ভেতর মাছ শিকারের অনুমতিপত্র নেন। অনুমতিপত্র নেওয়ার পর সেগুলো জেলেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়–কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত থাকে। শুধু সেসব জেলেকেই এই অনুমতিপত্র দেওয়া হয়, যারা সাহেবদের কাছ থেকে ঋণ নিতে এবং তাদের কাছে মাছ বিক্রি করতে রাজি হন।

আহরিত মাছ বিক্রির সমস্যাটি সারা দেশেই মৎস্যজীবীদের পুরানো সমস্যা আকারে হাজির রয়েছে। বিক্রির ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাতে আজো জিম্মি।

আছে নিখোঁজ হওয়াজনিত সমস্যা এবং ঋণের বোঝা

গ্রীষ্ম-বর্ষায় বড় নদী এবং সাগরে মাছ ধরার কাজ চিরাচরিতভাবেই ঝুঁকিবহুল। তার সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ দুর্যোগের সমস্যা।

কুয়াকাটা-আলীপুর মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি আনসার মোল্লা ৩ জুলাই দৈনিক যুগান্তরের স্থানীয় প্রতিনিধিকে জানান, গত পাঁচ বছরে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে কুয়াকাটাসংলগ্ন এলাকায় অন্তত ২৫-৩০ জেলে নিখোঁজ এবং ২০ জন মারা গেছে। মৎস্য সমিতির এই নেতা আরও বলেন, দুর্ঘটনায় মারা গেলে জেলেদের পরিবার ভিজিএফসহ সহায়তা থেকেও বঞ্চিত হয়। একই প্রতিবেদকের কাছে পটুয়াখালীর জেলেরা জানান, প্রতিবছর সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে অনেক জেলে মারা যাচ্ছে। এ ছাড়া গত এক দশকে ঋণগ্রস্ততার কারণে এই অঞ্চলের প্রায় দশ হাজারের মতো জেলে জন্মভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

গ্যাস দুর্ঘটনার মহামারি

থামানোর কেউ নেই; মৃত্যুর দায়িত্ব নিচ্ছে না কেউ

গত কয়েক বছর দেশজুড়ে নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম এক উৎস হয়ে উঠেছে গ্যাস বিস্ফোরণ। গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে এবং রান্নার জন্য সিলিন্ডার গ্যাসের প্রচলন যত বাড়ছে এরকম দুর্ঘটনার হারও তত বাড়ছে। দেশে রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের সংখ্যা বর্তমানে ২ থেকে ৩ কোটি বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া তিতাস গ্যাসের পাইপলাইন সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনাও বেড়ে যাচ্ছে বছর বছর।

গ্যাসজনিত সাম্প্রতিক বড় দুর্ঘটনা হিসেবে ২০১০ সালে পুরান ঢাকার নিমতলীতে ১২৪ জন, ২০১৯ সালে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় ৭১ জন এবং ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নারায়ণগঞ্জের একটি মসজিদে ৩৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা দেশবাসীর মনে আছে। তবে এরকম বড় বড় দুর্ঘটনার পরও এ সংকট নিরসনের সুরক্ষা উদ্যোগ তেমন বাড়েনি। দৈনিক কালের কণ্ঠের ২০২১ সালের ৭ আগস্টের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগের বছর গ্যাস থেকে প্রায় ২০০ বিস্ফোরণ-আগুনের ঘটনায় দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে দেশে। একই সময়ে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে অগ্নিকান্ডে প্রাণ গেছে ১৮৬ জনের। ঐ বছর কেবল নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৯৪ দফা গ্যাস বিস্ফোরণ হয়েছে এবং তাতে ৪৪ জন মারা গেছে। অথচ তাতে এ জেলার সুরক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। গত বছর এপ্রিলেও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি বাড়িতে ১১ জন দগ্ধ হয়েছে গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে। দৈনিক বণিকবার্তা ২০২১-এর ৩০ জানুয়ারি লিখেছে, মানহীন সিলিন্ডারে গ্যাস সরবরাহের কারণে আগের দুই বছরে প্রায় ১৮০০ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ৪০ জন।

দেশের প্রায় সকল জেলা থেকে হামেশা নানান ধরনের গ্যাস দুর্ঘটনার খবর ছাপা হচ্ছে পত্রপত্রিকায়। ২০২১-এর জুনে ঢাকার মগবাজারে অনুরূপ দুর্ঘটনায় ১২ জন মারা গেছে। জুলাইয়ে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় এক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এক পরিবারের ছয়জন দগ্ধ হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর ঢাকার মিরপুর এগারো নাম্বারে এক বাড়িতে গ্যাস দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ৫ জন।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে কোন কোন সংবাদ মাধ্যমে এখন এরকম দুর্ঘটনার সংবাদ দেখা যায়। এরকম প্রতিটি দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি হয় রীতিমতো বোমা বিস্ফোরণের মতো। ঘটনাস্থল ধুমড়ে মুষড়ে যায় তাৎক্ষণিকভাবে। প্রচুর মানুষ আহতও হচ্ছে।

দৈনিক যুগান্তর গত বছর ২৪ জুলাই ফায়ার সার্ভিস বিভাগকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে গত দশ বছরে গ্যাস, গ্যাসপাইপ, গ্যাস সিলিন্ডার ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় প্রায় এক হাজার ছয় শত মানুষ মারা গেছে। আহত হয়েছে এর কয়েক গুণ। ঐ একই প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের মতে, সিএনজিচালিত ৪৪ শতাংশ বাসের গ্যাস সিলিন্ডার মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সিএনজি সিলিন্ডার নিয়ে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন চলাচল করছে। বছরে প্রায় দেড়শ' গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডার পাঁচ বছর পরপর পুনঃপরীক্ষা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে– কিন্তু সেটা হচ্ছে না। মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই গণপরিবহনের চালক ও মালিকদের। অনেক চালক-

মালিকই জানেন না ঠিক কবে তাঁর গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার পরিবর্তন করা হয়েছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পরীক্ষা ও নজরদারি আবশ্যক।

উল্লেখ্য, রাজধানীতে চলাচল করা ৯০ শতাংশ বাসই বর্তমানে সিএনজিচালিত। জ্বালানি খরচ কমিয়ে আনতে দূরপাল্লার রুটগুলোতে এবং আঞ্চলিকভাবে দেশের প্রায় সকল এলাকায় বাড়ছে সিএনজিচালিত যানবাহনের সংখ্যা। এ অবস্থায় দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত মান পরীক্ষার মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ সিলিন্ডার বাছাই করা জরুরি। না হলে দেশে দুর্ঘটনার মহামারি শুরু হবে। গ্যাস ও সিলিন্ডারজনিত দুর্ঘটনার চিকিৎসাও সহজলভ্য নয়। কারণ এতে শরীর আগুনে ঝলসে যায়। এরকম সমস্যার চিকিৎসার সুবিধা দেশের খুব কম জেলা-উপজেলাতে আছে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্র প্রচারমাধ্যমকে নিয়মিত বলছে, গ্যাসের চেম্বার তৈরি হয়ে বিস্ফোরণ ও বৈদ্যুতিক গোলযোগে অগ্নিকান্ডের ঘটনা তদন্ত শেষে গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারীদের দায়দায়িত্ব উল্লেখ করে দুর্ঘটনা শেষেই তাদের তরফ থেকে প্রতিবেদন দেওয়া হয়। এতে একই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সতর্কতার সুপারিশ থাকে। এসব দুর্ঘটনার পেছনে অন্যতম কারণ হলো ঝুঁকিপূর্ণ অবৈধ সংযোগ, নির্মাণ-সংস্কার কাজের সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণ যাচাইয়ে চরম অবহেলা। প্রতিটি তদন্ত প্রতিবেদনেই করণীয় উল্লেখ করে সুপারিশ দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। কিন্তু তা বাস্তবায়নের কেউ নেই।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৩৮ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। সমস্যা হলো এরকম মৃত্যুর জন্য কাউকে দেশে জবাবদিহির মুখে পড়তে হচ্ছে না।

গ্যাস সিলিন্ডারের নির্দিষ্ট আয়ু থাকে। সাধারণত প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডারের আয়ু ১০ থেকে ১৫ বছর। এই সময় পরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। তাই আয়ু শেষ হলে সেগুলো বাতিল করা উচিত– এটা সাধারণ কান্ডজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে নজরদারিহীনতার মধ্যদিয়ে কান্ডজ্ঞানের ঘাটতি অত্যন্ত প্রকট হচ্ছে। কত বছর ধরে একটি সিলিন্ডার ব্যবহার হচ্ছে, ব্যবহারকারীদের কাছে সেই হিসাব থাকছে না। ২০১৯-এর ২০ অক্টোবর প্রথম আলো লিখেছিল, বিস্ফোরক অধিদপ্তর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ১১ হাজার গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষা করে দেখতে পায়– আট হাজার সিলিন্ডারই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঝুঁকির মাত্রা দেশজুড়ে অনেক ব্যাপক।

মাত্র ২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষা করা যায়। বিস্ফোরক অধিদফতরে এই পরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা। সারাদেশে পাঁচ লাখের বেশি গাড়িতে সংযোজন করা সিএনজি গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে মাত্র ক্ষুদ্র এক অংশের সিলিন্ডার এভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। সারাদেশে ৩২টি রিটেস্ট বা পুনঃপরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে বড় কয়েকটি বাদে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির সক্ষমতা ও পরীক্ষার মানের ব্যাপারে আস্থার সংকট রয়েছে।

বণিকবার্তা ২০২১-এর ৩০ জানুয়ারির প্রতিবেদনে লিখেছে, 'বর্তমানে ব্যক্তি খাতের হাতে এলপি গ্যাস বাজারের ৮০ ভাগের নিয়ন্ত্রণ। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস সমুদ্রপথে আমদানির পর সিলিন্ডারে ভর্তি করে বিপণন করছে। কিন্তু গ্যাসভর্তি এসব সিলিন্ডার বাজারে সরবরাহ এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে রয়েছে গুরুতর অনিয়ম।' গ্যাস ব্যবসায় মুনাফাকারীরা কোনোভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আসছে না।

নীরবে মহামারির বড় শিকার হলো গৃহশ্রমিক

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের গৃহশ্রমিকদের টানাপোড়েনের জীবন কাহিনী প্রায় সকলের কমবেশি জানা। এর মাঝেই এসেছিল কোভিড-১৯। যার তাৎক্ষণিক ছোবল পড়ে এই শ্রমজীবীদের জীবনে। অস্থায়ী 'কাজের লোক'দের প্রায় অধিকাংশকে মহামারির প্রথম ঢেউয়েই বিদায় করে দেয়া হয়। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই বিদায়পর্বে কোন ধরনের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে স্থায়ী গৃহশ্রমিকদের মাঝে যারা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে– গত দুই বছরে তাদের অনেকেই আর ফিরতে পারেনি বা ফেরার অনুমতি পায়নি। এই প্রক্রিয়ায় গৃহশ্রমিকদের মজুরিও কমেছে অনেক। বিপুল বেকারত্বের সুযোগ নিয়েছে মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো। গৃহশ্রমিকদের ঘরোয়া বন্দিত্ব বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ।

আবার মহামারিকালে সরকারি তরফে নানানভাবে যেসব ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে– গৃহশ্রমিকরা তার সামান্যই হদিস পেয়েছে। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রশাসনিক কাঠামো এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থেকে তাদের অবস্থান বেশ দূরে। ক্ষমতাহীন, সংগঠনহীন, পারিবারিক প্রভাব-পরিচিতিহীন আধা-ভাসমান এক জীবন তাদের। মহামারি তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে বিপন্নতার অজানা গন্তব্যে।

এর মাঝেই তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনও অব্যাহত ছিল। প্রত্যাশা মতো বাস্তবায়ন হয়নি বহুল আলোচিত 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'র বাস্তবায়ন। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি বাস্তবায়ন না হওয়ায় দেশে করোনার মাঝেও গৃহশ্রমিকের মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বিচারহীনতার কারণে দোষীরা বারবার গৃহশ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের সাহস পাচ্ছে। ২০২১ সালের মে মাসে ঢাকার মহাখালিতে 'সাত তলা সরকারি কোয়ার্টারে' শ্যামলী বৈরাগী ও বাদল সিকদারের বাসায় ১১ বছর বয়সী আমেনার নির্যাতিত হওয়ার ব্যাপক প্রচারিত ঘটনা নতুন করে আবার গৃহশ্রমিকদের দুরবস্থার কথা দেশবাসীকে জানালো। যশোর সদরের মেয়ে আমেনার সারা শরীরে গৃহকর্ত্রী ও গৃহকর্তার নির্যাতনের চিহ্ন দেখা গেছে প্রচারমাধ্যমের সূত্রে।

হাসপাতালে আমেনাকে চিকিৎসা দেয়া যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. অজয় কুমার সরকার জানিয়েছেন, তার শরীরে অসংখ্যা পোড়া বা ছ্যাঁকার দাগ ও নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। অনেক ক্ষত শুকিয়ে গেছে। অনেক দিন ধরে এ ক্ষতগুলো হয়েছে। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে।

যশোরে ফেরার পর আমেনাকে হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তিতে সহযোগিতা করা রক্তদাতা ও সামাজিক সেবামূলক সংগঠন স্বজন সংঘের সাধারণ সম্পাদক সাধন

কুমার দাস জানান, জোহরা খাতুন প্রথমে আমেনাকে নিয়ে গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন।

এমন নির্যাতনের খবর পেয়ে তিনি ও তার সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় কুমার নন্দী তাদের হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে। মামলা করার জন্য যশোর কোতোয়ালি থানায়ও যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু থানা থেকে ঢাকার সংশ্লিষ্ট থানায় মামলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সাধন কুমার দাস বলেন, আমেনার পরিবার অসহায় দরিদ্র মানুষ। তাদের পক্ষে ঢাকায় গিয়ে মামলা করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি মামলা দায়ের ও নির্যাতনকারীদের শাস্তির জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন।

আমেনার ঘটনায় প্রতিবাদ ও নিন্দার মাঝেই পত্রপত্রিকায় আসে চট্টগ্রামের নিলুফা বেগমের নির্যাতনের ঘটনা। ৩১ মে প্রকাশিত খবরে দেখা যায় চট্টগ্রাম নগরীর হামজারবাগ এলাকায় নিলুফার বেগম (১৫)কে তিনমাস ধরে নির্যাতনের পর মৃত ভেবে জেলার রাঙ্গুনিয়ার লিচুবাগান এলাকায় ফেলে আসা হয়। ঘটনায় নিলুফারের কর্মস্থলের মালিক দম্পতি ও দারোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানিয়ে পাঁচলাইশ থানার ওসি জাহিদুল কবির বলেছেন, একটি দুর্গম এলাকা থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে রাঙ্গুনিয়া থানা পুলিশ। পরে তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে পুলিশের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেয়।

পত্রিকায় প্রকাশের পর এই ঘটনায় 'গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' গভীর উদ্বেগ জানায়। একই সাথে এ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানায় তারা।

উল্লেখ্য, গৃহশ্রমিকদের নির্যাতন নিপীড়নের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে: সঠিক সময়ে মামলা দায়ের না হওয়া; অর্থের বিনিময়ে মামলায় আপোষ করা; ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে অপরাধী রক্ষা পেয়ে যাওয়া, অর্থের অভাবে গৃহশ্রমিকদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে না পারা এবং মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় কঠিন হয়ে পড়া। সচরাচর যে যে উপায়ে গৃহশ্রমিকদের নির্যাতন করতে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে গরম পানি ঢেলে দেয়া, লাঠি দিয়ে মারা, গরম খুন্তির চ্যাকা দেয়া, ধর্ষন ও অন্যান্য ধরনের যৌন নির্যাতন। জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত খবরের আলোকে ২০১১ থেকে পরবর্তী এক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বছরওয়ারী গৃহশ্রমিক হত্যার ঘটনা সর্বোচ্চ ৩৮ থেকে সর্বনিম্ন ১৬ জন ছিল। আহত হওয়ার ঘটনা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং সেগুলোর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সংবাদ মাধ্যম পর্যন্ত আসে।

উল্লেখ্য, গৃহশ্রমিকরা বাংলাদেশে শ্রম আইনে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী নয়। শ্রমিক নেতারা সব সময়ই এই খাতকে আইনে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাচ্ছে। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬' এর আওতা বহির্ভূত থাকায় গৃহশ্রমিকরা মানবিক অধিকার, শোভন কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ-২০১৬-১৭ তথ্য অনুযায়ী, দেশে গৃহস্থালি কাজে জড়িত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ, যাদের ৯০ শতাংশ নারী। অন্যদিকে, শ্রম বিষয়ে গবেষণা সংস্থা 'বিলস্'-এর ২০২০ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উক্ত সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ বলে উল্লেখ রয়েছে।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি যৌথভাবে দরিদ্র মানুষের ওপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব নিয়ে একটি জরিপ করেছিল ২০২০ সালে। ৪ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত টেলিফোনে এ জরিপ করা হয়। জরিপে অংশ নেন ৫ হাজার ৪৭১ জন। এতে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, গৃহকর্মীদের ৫৭ শতাংশের কোনো কাজ নেই। এই গৃহকর্মীদের ৭৬ শতাংশ আয় কমেছে। এরকম শ্রমিকের সংখ্যা করোনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গে আরও বেড়েছিল। এদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক সহায়তার দাবি রয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলোর তরফ থেকে। শ্রমিক নেতারা একই সঙ্গে প্রতিনিয়ত এও বলছেন, অর্থের বিনিময়ে চুক্তিভিত্তিক গৃহশ্রমকে শ্রম আইনের আওতায় আনা জরুরি।

উল্লেখ্য, গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা অনুযায়ী, প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে গৃহকর্মীদের বেতন পরিশোধ, চাকরি থেকে অপসারণের ক্ষেত্রে এক মাস আগে না জানালে ৩০ দিনের মজুরি প্রদান, মাতৃত্বকালীন নারী গৃহকর্মীর স্বাবেতনে ১৬ সপ্তাহ ছুটি এবং কর্মক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণসহ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। এ ছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী, ১২ বছর বয়সীদের গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগের আগে আইনানুগ অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে হবে। ১৮ বছরের আগ পর্যন্ত তাদের ভারী কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। কিন্তু উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন তদারকের কোন কাঠামো না থাকায় গৃহশ্রমিকরা সুফল থেকে বঞ্চিত।

রাষ্ট্রের বন্ধ পাটকল ইজারার কথা শোনা গেল

২০২০ সালে পাটকল খাতের বড় খবর ছিল রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলো বন্ধ হওয়া। ২০২১ সালে এসে একই খাতের বড় খবর হয়েছে ঐ বন্ধ কারখানাগুলোর বড় অংশ ইজারার মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কয়টি কারখানা ইজারা দেয়া হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলেও এটা প্রায় সকলে বলছে, ইজারার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত।

২০২০ সালে বন্ধ করার সময় বলা হয়েছিল সরকার এসব পাটকল 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের' মাধ্যমে চালাবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। বরং প্রায় এক বছর মিলগুলো বন্ধ করে রাখার পর বলা হলো সরকার এসব কারখানা লিজ দেয়ার জন্য শর্তাদি তৈরি করেছে এবং দেশ-বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান একদা 'লোকসানের দায়ে বন্ধ' হওয়া কারখানা লিজ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ জুটমিল কর্পোরেশনের সূত্র উদ্ধৃত করে ২০২১-এর সেপ্টেম্বরে দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র জানিয়েছে, সরকার ৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদে পূর্বাহ্নে বন্ধ করা পাটকলগুলো লিজ দেয়ার আয়োজন করছে।

তবে এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠেছে ৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদের জন্য এসব কারখানায় নতুন বিনিয়োগ করতে নতুন ব্যবসায়ীরা আগ্রহী হবে কি না। ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা কারখানাগুলো নতুন করে চালাতে হলে এবং মুনাফা করার অবস্থায় নিতে হলে সেসবের যন্ত্রপাতি খাতে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। সেক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন– স্বল্পমেয়াদের লিজে তা উঠিয়ে আনা যাবে কি না সে প্রশ্ন থাকছেই। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে প্রস্তাবিত লিজ আকর্ষণীয় ও লাভজনক হতে পারে তার মেয়াদ বেশি হলে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সরকারি শর্তে ইজারার মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রাখা হবে।

এসব বন্ধ মিলের অনেকগুলোরই অনেক ধারদেনা রয়েছে। সেসবের ভার কে বহন করবে সেসব বিষয়েও স্পষ্ট কোন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি এ লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত। ধারদেনার বিষয় ফয়সালা না হলে একই মিলের নামে নতুন করে নতুন উদ্যোক্তাদের পক্ষে ব্যাংকঋণ পাওয়া সহজ হবে না। দ্য ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলগুলোর ধারদেনার পরিমাণ প্রায় হাজার কোটি টাকা। ইজারাদাররা এসব মিলের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ নিতে পারবে কি না সেটাও বিস্তারিত জানা যায়নি এখনও।

এদিকে শ্রমিকরা ইজারার খবরে এই মর্মে উদ্বিগ্ন যে নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে যার যার মিলে তাদের কর্মসংস্থান হবে কি না। বিজেএমসি ইজারার ক্ষেত্রে পুরানো শ্রমিকদের নিয়োগের শর্ত বেঁধে দিবে কি না সে বিষয়েও শ্রমিকরা এখনও স্পষ্ট আশ্বাস পায়নি।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার আগে পাটকল ছিল ৭৫টি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির এক আদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন, পরিত্যক্ত ও সাবেক ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের ৭৮টি পাটকল তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় বিজেএমসি গঠিত হয়।

১৯৮১ সালে মিলের সংখ্যা বেড়ে হয় ৮২টি। ১৯৮২ সালের পর ৩৫টি পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণ, ৮টি মিলের পুঁজি প্রত্যাহার ও ১টি পাটকল একীভূত করা হয়।

১৯৯৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের পাটখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সময়ে ১১টি মিল বন্ধ, বিক্রি ও একীভূত করা হয়।

২০০২ সালে আদমজী জুট মিলস বন্ধ করা হয়। এর পর বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীনে পাটকল ছিল ৩২টি। এর মাঝে, ৫টি মিলের মামলা আদালতে বিচারাধীন। একটিতে বিশেষ একটা উৎপাদন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে; আর অপর একটিতে বিক্রয়োত্তর মামলা রয়েছে।

সর্বশেষ, তিনটি নন-জুট মিলসহ সচল ছিল ২৫টি। তবে অব্যাহত লোকসানের কারণে ২০২০ সালের জুলাই মাসে সবগুলো পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে সরকার।

মিলগুলো বন্ধ থাকায় ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে স্বেচ্ছায় অবসর বা গোল্ডেন হ্যান্ডশেকে শ্রমিকদের পাওনা নগদ টাকা ও সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ২৫টি মিলের মধ্যে ৪টি মিলের মিলের শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে। ৩৪ হাজার ৭৫৭ স্থায়ী শ্রমিকদের ২ লাখ টাকার উর্ধ্বে পাওনার ক্ষেত্রে অর্ধেক নগদে ও অর্ধেক তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

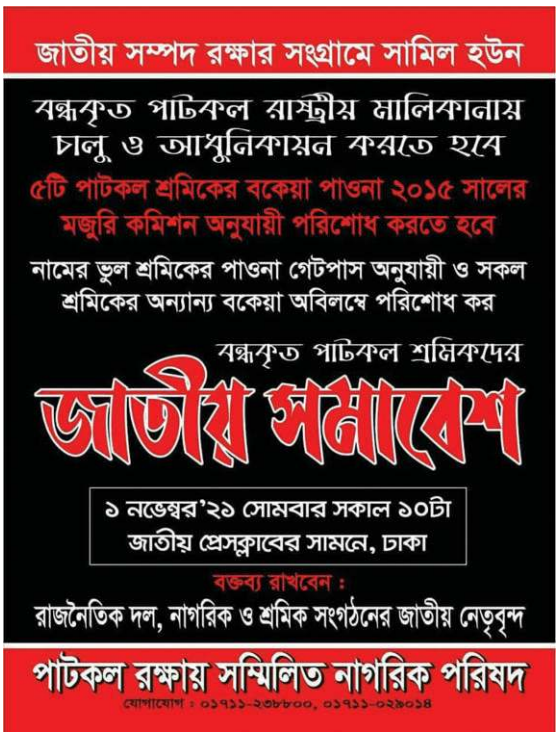

পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলনের পোস্টার, ২০২১

দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা জানিয়েছে, বন্ধ থাকা এসব জুটমিলের মধ্যে ১৭টি ইজারা দিতে চায় সরকার। মিলগুলোর ৫টি চট্টগ্রাম অঞ্চলের, ঢাকা অঞ্চলের ৪টি ও খুলনা অঞ্চলের ৮টি। এই পত্রিকার ১১ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে বলা হয়: বিজেএমসির তথ্যানুযায়ী, ঢাকা জোনে পাটকল ৭টি। যার মধ্যে চারটি ইজারা দেওয়া হবে।

চট্টগ্রাম জোনে মিল ১০টি, যার মধ্যে পাঁচটি ইজারা দিতে চায় সরকার। মিলগুলো হচ্ছে- হাফিজ জুট মিলস, এম.এম জুট মিলস, সীতাকুন্ডের আর.আর জুট মিলস; গুল আহমেদ জুট মিলস, কুমিরা; কেএফডি জুট মিলস, রাঙ্গুনিয়া। খুলনা অঞ্চলের আটটি মিলই ইজারা দেওয়া হবে। মিলগুলো হলো: প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলস, ক্রিসেন্ট জুট মিলস, ইস্টার্ন জুট মিলস, দৌলতপুর জুট মিলস, স্টার জুট মিলস, যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং কারপেটিং জুট মিলস লিমিটেড।

তবে প্রথম আলো ১২ সেপ্টেম্বর তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে সরকার ১২টি মিল ইজারা দিতে চায়। এসব মিলের ইজারার জন্য ইতিমধ্যে দেশি-বিদেশি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ২৯টি প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হলেই ইজারা দেওয়ার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হবে। একই প্রতিবেদনে বলা হয় প্রথম পর্যায়ে ১৭টি পাটকল ইজারা দেওয়ার জন্য গত এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে বিজেএমসি। সেগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম অঞ্চলের হাফিজ জুট মিলস, গুল আহমেদ জুট মিলস, কেএফডি জুট মিলস, এমএম জুট মিলস, আরআর জুট মিলস; ঢাকা অঞ্চলের ইউএমসি জুট মিলস, বাংলাদেশ জুট মিলস, রাজশাহী জুট মিলস, জাতীয় জুট মিলস এবং খুলনা অঞ্চলের প্লাটিনাম জুবেলি জুট মিলস, ক্রিসেন্ট জুট মিলস, ইস্টার্ন জুট মিলস, খালিশপুর জুট মিলস, দৌলতপুর জুট মিলস, স্টার জুট মিলস, যশোর জুট মিলস ও কার্পেটিং জুট মিলস।

আন্তর্জাতিক দরপত্র ডাকার পর দেশি-বিদেশি ২৪টি প্রতিষ্ঠান ১৪টি পাটকল ইজারা নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথকভাবে ৫৯টি প্রাথমিক প্রস্তাব জমা দেয়। তখন খুলনা অঞ্চলের খালিশপুর, প্লাটিনাম ও স্টার জুট মিলস ইজারা নেওয়ার জন্য কোনো প্রস্তাব আসেনি।

শেষ পর্যন্ত ১২টি পাটকল ইজারা নেওয়ার জন্য ২৯টি চূড়ান্ত পরিকল্পনা আসে। এবারে চট্টগ্রামের এমএম ও নরসিংদীর ইউএমসি জুট মিলস নিতে কোনো প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখায়নি। আর ২৯টি চূড়ান্ত পরিকল্পনার মধ্যে

ভারতের কয়েকটি সংস্থার তরফ থেকে চারটি পাটকল ইজারা পেতে আবেদন করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজ, ইস্টার্ন জুট মিলস, কার্পেটিং জুট মিলস ও দৌলতপুর জুট মিলস। আর যুক্তরাজ্যের জুট রিপাবলিক চেয়েছে সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিলস।

উল্লেখ্য, প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী যে ১২টি পাটকল ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে জমির পরিমাণ ৬৮৯ একর। সর্বোচ্চ ১১৩ একর জমি রয়েছে খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিলের।

এসব সংবাদের পাশাপাশি ২০২১-এর ৫ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর জুটমিল যৌথ কারখানা কমিটি বলেছে: দেশের অন্যত্র বন্ধ হওয়া পাটকলের শ্রমিকরা বকেয়া পাওনার বেশিরভাগ টাকা পেলেও এখানকার ৫টি মিলের শ্রমিকদের পাওনা এখনও বাকি। দৈনিক সমকালের ৫ অক্টোবরের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, সরকারের ঘোষিত গেজেট অনুযায়ী বকেয়া, গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় প্রাপ্য অর্থ, ৬০ দিনের নোটিশ পে, উৎসব বোনাসের ডিফারেন্স, দুই মাসের লকডাউনের টাকাসহ সব পাওনা অবিলম্বে এককালীন পরিশোধ ও বন্ধ সব পাটকল রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালু করার দাবি জানানো হয় উপরোক্ত সংবাদ সম্মেলনে। এছাড়া ২০২১-এর ১ নভেম্বর ঢাকায়ও সমাবেশ করেছে 'পাটকল রক্ষায় সম্মিলিত নাগরিক পরিষদ' নামের সংগঠন । তারা বন্ধ পাটকলগুলো চালুর দাবি জানায়।

মহামারিতে তাঁতশিল্পে অর্থনৈতিক বিপর্যয়

মহামারিতে পরপর দু'বছর ২০০০ এবং ২০২১ সালে ঈদ, পূজা এবং বৈশাখের উৎসবে জমেনি। এছাড়া বিয়েশাদিও অনেক কম ছিল; লকডাউনে বন্ধ ছিল সাধারণ বেচাকেনাও। ধারাবাহিক এই বন্ধ অবস্থায় দেশের যেসব শিল্পখাত গত বছর চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার একটা হলো টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলার শাড়িশিল্প। এ অঞ্চলের কারিগরদের খুবই বিপন্ন অবস্থায় কেটেছে গত দুই বছর। কেবল আয়রোজগার বন্ধ থাকাই নয়– বিপুল ঋণের ভারে কারিগর পরিবারগুলো বিপর্যস্ত এখন। সরকারি প্রণোদনা ছাড়া এই খাত এবং এই খাতের কারিগরদের পক্ষে শিগগির আর্থিকভাবে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হবে বলে মনে করছেন না খাত সংশ্লিষ্টরা। অনেক কারিগর পরিবার বাঁচাতে ইতোমধ্যে পুরানো পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছে বা যেতে বাধ্য হচ্ছে।

করোনার ছোবলে কারিগরদের পাশাপাশি এখাতের ব্যবসায়িক উদ্যোক্তারাও আর্থিকভাবে সংকটে আছেন বলে জানিয়েছেন। অনেকে তাঁরা সুদমুক্ত ঋণের দাবি তুলেছে। কিন্তু তার কোন বন্দোবস্ত পাননি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং কারিগররা জানিয়েছেন, কেবল দুই বৈশাখে শাড়ির চাহিদা না থাকায় প্রায় ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা নষ্ট হয়েছে এখানে। এটা ঈদ ও পুজার বেচাকেনার বাইরের ক্ষতি। তাঁত খাতের এই বিপর্যয়ে পুরো টাঙ্গাইলের অর্থনীতিতেও বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

শাড়ি ছাড়াও টাঙ্গাইলের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, তাঁতশিল্পের লুঙ্গি, গামছা, চাদর ইত্যাদি সারা বছরই কমবেশি বিকিকিনি হয়ে থাকে। সচরাচর তাঁতশিল্পের পণ্যের অধিকাংশ ক্রেতা সড়কপথে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই জেলায় এসে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাজারজাত করে থাকে। এখানকার অনেক তাঁতিবাড়িতে রয়েছে বিক্রয়কেন্দ্র। জেলার করটিয়া, বাজিতপুর, পাথরাইল, বল্লা, রামপুর, জোকারচর হাট তাঁত-কাপড় বেচাকেনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। গত দু'বছরে তিন দফায় এসব এলাকায় শিল্পের ক্ষতি হয়। প্রথমত করোনার দুই ঢেউয়ে এবং তৃতীয়ত প্রথম ঢেউ পরবর্তী বন্যায়। ক্রেতা না আসায় অনেক মাকু যেমন থেমে গেছে– বিক্রয়কেন্দ্রও বন্ধ।

তাঁত মালিক, শ্রমিক ও তাঁত বোর্ডের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, করোনার প্রথম ঢেউয়ে ২০২০ সালের ২৬ মার্চ থেকে ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ রাখায় তাঁতে থাকা সুতার ভিমে পোকার আক্রমণ হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এরপর দেখা দেয় দীর্ঘস্থায়ী বন্যা। অনেক ফ্যাক্টরিতে পানি ঢুকে তাঁত ডুবে যায়। এরপর ফের আবার করোনার প্রকোপ বাড়ে দেশে। তখন নতুন করে

জারি হওয়া লকডাউনের ফলে ঘরে থাকা জমানো তাঁতপণ্যও বাজারজাত করা যায়নি। এভাবে প্রলম্বিত এক সংকটে পড়ে যায় এই এলাকার কারিগর ও উদ্যোক্তারা।

উল্লেখ্য, তাঁতশিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য এই জেলার তাঁতবোর্ডের দুটি 'বেসিক সেন্টার' রয়েছে। ঘাটাইল, মধুপুর, ধনবাড়ী, গোপালপুর, কালিহাতী ও ভূঞাপুর উপজেলার জন্য একটি সেন্টার এবং সদর উপজেলার বাজিতপুরে দেলদুয়ার, বাসাইল, মির্জাপুর, নাগরপুর, সখীপুর ও সদর উপজেলার জন্য আরেকটি সেন্টার রয়েছে।

এ দুটি বেসিক সেন্টারের নিয়ন্ত্রণে অনেকগুলো তাঁতি সমিতি আছে। এসব সমিতির অধীনে মহামারির আগে প্রায় চার হাজার তাঁতফ্যাক্টরি মালিকের প্রায় ২৮ হাজার সচল তাঁত ছিল। এর বাইরে ২-৩ হাজার তাঁত ছিল বন্ধ। কারিগর আছে এখানে প্রায় এক লাখ। করোনাকালে এসে ধারাবাহিকভাবে পূর্বে সচল তাঁতও অচল হতে থাকে। ফলে তাঁতিরা বেকার হয়ে যায়।

২০২১ সালের ২২ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপকালে স্থানীয় বড় তাঁত উদ্যোক্তা যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানির মালিক রঘুনাথ বসাক জানান, গত বছর ঈদ সামনে রেখে পাথরাইলে উৎপাদিত মোট শাড়ির ৮০ শতাংশ অবিক্রীত ছিল। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর দুর্গাপূজা ও পরবর্তী সময়ে সেই ৮০ ভাগের ৫০ ভাগ শাড়িও বিক্রি করা যায়নি। সেই কারণে ২০২১ সালের ঈদে এলাকায় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অর্ধেক শাড়ি তৈরি হয়েছে। কিন্তু পয়লা বৈশাখ তথা নববর্ষ ও ঈদের বাজার শুরু হওয়ার আগেই আবার শুরু হয় লকডাউন। ফলে পুরানো সংকটের সঙ্গে যোগ হয় নতুন সংকট। সর্বশেষ তারা আশা করছিলেন ২০২১-এর দুর্গাপূজার বেচাবিক্রির ওপর।

টাঙ্গাইলে শাড়ি শিল্পের একটা বড় কেন্দ্র পাথরাইল। জেলা শহর থেকে আট কিলোমিটার দক্ষিণে এই ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে অনেক ধরনের ঐতিহ্যবাহী তাঁতের শাড়ি উৎপাদিত হয়। আড়াই শতাধিক পরিবার সরাসরি শাড়ি তৈরি ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে যুক্ত আছে আরও দুই হাজারের বেশি পরিবার। পাথরাইল গ্রামের সীতানাথ-রঞ্জিত শাড়ি বিতানের পলাশ বসাক জানিয়েছেন, ব্যাংক ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে বেশির ভাগ ব্যবসায়ী শাড়ি তৈরি করে। দীর্ঘ দুই বছরের থেমে থেমে লকডাউনের কারণে বেচাবিক্রি হয়নি। ধারাবাহিক ধাক্কায় শাড়ি উৎপাদন এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের কোমর ভেঙে গেছে। সামনের দিনগুলোও তাঁতপণ্য উৎপাদন ও বিপননের জন্য নিশ্চিত সময় নয়। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প এবং এর কারিগরদের বাঁচাতে বড় আকারে আর্থিক প্রণোদনা প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয় সকলে। এরকম প্রণোদনা প্রয়োজন টাঙ্গাইলের বাইরের অন্যান্য জেলার তাঁতশ্রমিকদেরও। যেমন গত বছর পাবনার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সেখানে প্রায় ২০ হাজার তাঁতের কারিগর টাঙ্গাইলের মতো সংকটে পড়েছে। দেশের তাঁতপণ্যের বড় এক অংশ উৎপাদিত হয় পাবনা ও সিরাজগঞ্জে। উভয়স্থানে করোনার প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি সুতার অনিয়ন্ত্রিত বাজার তাঁতীদের বিপদে ফেলছে।

এ বিষয়ে এক লেখায় গবেষক ফরিদা আখতার দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে ২০২১-এর ২ সেপ্টেম্বর লিখেছেন পাবনা ও সিরাজগঞ্জের চিত্তরঞ্জন তাঁতে ২৫ থেকে ৩০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান ছিল। এই দুটি জেলা দেশের সর্ববৃহৎ তাঁত এলাকা। এদের মধ্যে সারা বছরে ঈদের সময় ৬০ শতাংশ তাঁতবস্ত্র বিক্রি হয় শাহজাদপুর হাটেই; লেনদেন হয় প্রায় ২০০ কোটি টাকার। কিন্তু এবার ঈদের আগে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে দোকান খোলার কারণে মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ তাঁতবস্ত্র বিক্রি করা গিয়েছিল।

তিনি আরও লিখেছেন, ঈদে বাজার ধরার জন্যে করোনার আগে শব-ঈ বরাতের পর থেকে কাপড় বিক্রির তোড়জোড় লেগে যেত। ঈদ উপলক্ষ্যে সব শাড়ি রোজার আগে পাইকারদের কাছে বিক্রি হয়ে যেত। গত ৩০ থেকে ৪০ বছর তাঁতীরা এভাবেই কাজ করে আসছেন। কিন্তু ২০২০-২১ এ তার কিছু ঘটেনি। তাঁতীদের ঘরে ঘরে কাপড় পড়ে আছে কিংবা বোনা বন্ধ।

নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তায়
রাষ্ট্রীয় মনযোগ প্রয়োজন

বাংলাদেশের বড় এক শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী নির্মাণ খাতের কর্মীরা। এই খাতের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে পেশাগত কাজের সময়। নির্মাণ শ্রমিকদের দাবি, রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে এখন প্রতিদিন গড়ে ৪০ লাখের মতো শ্রমিক এখাতে নানা ধরনের কাজ করছে। দুর্ঘটনার হারও এখাতে তাই বিপুল।

দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে সক্রিয় এক খাত এখন অবকাঠামো উন্নয়ন। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত না করেই দেশজুড়ে যত্রতত্র নির্মাণ কাজ হচ্ছে। ফলে এই খাতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। মারা যাচ্ছে ও আহত হচ্ছে শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ। শহুরে এলাকায় শ্রমখাতের তদারকির সংস্থা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন ধরনের কর্তৃপক্ষ রাজউক, চউক ইত্যাদি সংস্থা নির্মাণ কাজের সুরক্ষা বিধিবিধান প্রতিপালনে প্রত্যাশা মতো সক্রিয় নয়। নির্মাণ কাজে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নজরদারি দুর্বল। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের মতো গুরুতর বিষয়ে অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা চিঠি চালাচালিতেই সীমাবদ্ধ। এ সেক্টরে কর্মরত নির্মাণ শ্রমিকরা তাই অসহায় ও অসন্তুষ্ট। তারা বলছে, সরকার ও মালিকপক্ষের অবহেলার কারণে ২০২১ সালেও এ খাতে দুর্ঘটনার ধারা কমেনি।

বেসরকারি সংস্থা সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটির অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গত দশকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৪০জন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় পত্রপত্রিকায়। মিডিয়ার খবরের বাইরেও অনেক শ্রমিক মারা গেছেন বা আহত হচ্ছেন নিয়মিত। ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)-এর মতে গড়ে এই খাতে বাৎসরিক মৃত্যু প্রায় ১২০ জন। ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যাগত হিসাবে পরিবহন খাতের পরই নির্মাণ খাতের অবস্থান। দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২০২১-এর ১১ এপ্রিল লিখেছে, ২০০২ থেকে ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ খাতে ১ হাজার ৭৪৫ জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটির পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ভালো সিঁড়ির অভাব ও সিঁড়িতে পর্যাপ্ত আলোর অভাব; এলোমেলোভাবে রড, বালু ও ইট রাখা; কর্মক্ষেত্রে নেট না থাকা অথবা পুরানো দুর্বল নেটের ব্যবহার; কপিকলের

ব্যবস্থা না থাকা; হেলমেট, গ্লাভসের ব্যবস্থা না করা; খালি পায়ে কাজ করা; অসাবধানতা ও অসচেতনভাবে আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ, তীব্র রোদে কাজ করা; ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার; বিশ্রাম করার সময় না পাওয়া; দুর্বল মাচা; দেয়াল বা মাটি চাপা পড়া; ঝুলন্ত অবস্থায় কাজের সময় বেল্ট ব্যবহার না করা; ভালো জুতা বা বুট ব্যবহার না করা; আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ও ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইনের কারণে নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা ঘটছে। আহত ও নিহত হচ্ছে কর্মীরা। এরকম দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি।

শুধু চিঠি দেয়া-নেয়া

২০২০ সালের ১৮ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলো তাদের এক প্রতিবেদনে লিখেছে, নির্মাণকাজে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ শ্রমিক মারা যান নির্মাণস্থলে উঁচু থেকে নিচে পড়ে, ৭ থেকে ৮ শতাংশ শ্রমিক মারা যান আগুনে পুড়ে ও চোখে আঘাত পেয়ে। এছাড়া প্রায় ৪০ শতাংশ শ্রমিক দুর্ঘটনায় হাত-পা কেটে গিয়ে বা আঙ্গুল কেটে পড়ে অঙ্গহানির শিকার হচ্ছে।

এ বিষয়ে রাজউক ও চউকের অভিমত হলো তাদের কাজ ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড অনুসরণ হয় কি না সেটা দেখা। নির্মাণ কাজে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয় দেখাশোনার মূল দায়িত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের। অন্যদিকে এই অধিদপ্তর থেকে সমস্যা হিসেবে বলা হচ্ছে জনবলের অভাবের কথা। এই প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে

বলেন, কোনও ভবনে যখন দেখা যায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে নির্মাণ করা হচ্ছে তখন প্রথমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে ভবন মালিককে চিঠি দেয়া হয় আমাদের তরফ থেকে। তাতে সমাধান না হলে দ্বিতীয়বার চিঠি দেয়া হয়। এরপরেও সমাধান না হলে আবারও চিঠি দিয়ে কোর্টে মামলা করা হয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের হাতে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা নেই। ফলে আইন লঙ্ঘনের তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না এই সংস্থার কর্মকর্তারা। অন্যদিকে কোর্টে মামলা হলে সেটা বেশ দীর্ঘ সময়ের একটা ব্যাপার হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, রাজউক বা চউকের দায়িত্ব বিল্ডিং কোডের নিয়মনীতি বাস্তবায়ন। কর্মকালীন একজন শ্রমিকের কী কী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে ঐ কোডে। বর্তমানে কার্যকর জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুযায়ী কাজের সময় শ্রমিকের মাথায় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। এছাড়া যারা কংক্রিটের কাজে যুক্ত তাদের হাতে গ্লাভস ও চোখের জন্য ক্ষতিকর কাজে শ্রমিকদের চশমা ব্যবহার করতে হবে। ওয়েল্ডিংয়ের সময় গ্লাভস, নিরাপত্তা বুট, অ্যাপ্রোণ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ভবনের ওপরে কাজ করার সময় শ্রমিকের নিরাপত্তায় বেল্ট ব্যবহারও বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এসব বিধানের বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না সে বিষয়ে শক্ত নজরদারি আজও অনুপস্থিতি।

'সরকারি ও বেসরকারি সব পর্যায়ে কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করে। কিন্তু এ নীতিমালা কেউ মানে বলে মনে হয় না' মন্তব্য করেছেন গবেষক গওহার নঈম ওয়ারা।

অথচ ২০২১-এর মে দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'অবশ্যই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিশ্চিত করতে হবে।'

দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রশ্ন

নিরাপত্তার পাশাপাশি নির্মাণ শ্রমিকদের অসন্তোষের আরেক ক্ষেত্র ক্ষতিপূরণ প্রশ্ন। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন এই খাতের শ্রমিক সংগঠকরা আন্দোলন করছেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও শ্রমিক মৃত্যুবরণ করলে আগে এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান ছিল। ২০১৮ সালের শ্রমআইনে মৃত্যুর কারণে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দ্বিগুণ করে দুই লাখ টাকা করা হয়েছে। আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ক্ষতিপূরণের টাকাও দ্বিগুণ করা হয়েছে। আগে এই ক্ষতিপূরণ ছিল এক লাখ ২৫ হাজার টাকা। সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে আড়াই লাখ টাকা। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রক্রিয়া মোটেই সহজ নয় এবং শ্রমিক-বান্ধব নয়। বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি সিদ্দিক এ প্রশ্নে প্রথম আলোকে জানান, হতাহত শ্রমিকদের পক্ষে প্রভাবশালী লোক না থাকলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না সহজে। একজোট হয়ে মামলার ভয় দেখালেই কেবল কিছু কাজ হয়। প্রথম আলোর অনুসন্ধান জানিয়েছে, নির্মাণ খাতে ছোটখাটো দুর্ঘটনায় কোনো ক্ষতিপূরণই পাওয়া যায় না। নিজের খরচে চিকিৎসা করাতে হয়।

নির্মাণ খাতের আরেক সমস্যা দেখা যায় শ্রমিকদের স্থায়ী কোন পরিচয় পত্র না থাকা। যা তার পেশাগত নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে রাখে। সচরাচর এই খাতের শ্রমিকেরা অস্থায়ী কর্মী হয়ে থাকে। ইমারত নির্মাণের কোম্পানিগুলো মূলত ঠিকাদারদের মাধ্যম শ্রমিক নিয়োগ দেয়। এই শ্রমিকদের আয় থেকে একটি অংশ নিয়মিতভাবে নিয়ে নেয় ওই ঠিকাদারেরা। কিন্তু দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে কিংবা পরে হতাহত শ্রমিকদের দায়িত্ব নেয় না তারা। সবাই তখন অচেনা হয়ে যায়। ২০২০ সালে ঢাকার ধানমন্ডিতে দিনেদুপুরে তিনজন শ্রমিক উঁচু ইমারত থেকে পড়ে মারা যাওয়ার পরও কেউ তাঁদের নাম বলতে পারেনি। কেউ জানতো না ইমারতের মালিকের নাম। কারণ কাগজেপত্রে শ্রমিকদের সঙ্গে ভবন মালিকের কোন চুক্তি থাকে না সচরাচর। নিয়োগপত্র দূরে থাক, মাস্টাররোলও থাকে অনুপস্থিত। এ কারণে মৃত বা আহত ব্যক্তি যে কথিত ইমারতে কাজ করতেন, সেটা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ নিহত-আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে কেউ দাঁড়াতে চাইলে এই তথ্যগুলো খুবই প্রয়োজন হয়।

নির্মাণ শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠক আজীবন পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকদের ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয় শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা, নির্মাণ শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো, নির্মাণ শ্রমিকদের জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে ২০২১ সালেও বিভিন্নভাবে সোচ্চার ছিল। তবে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের উপরে উল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্মাণ শ্রমিকই কোন ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ নয়। তাদের দুরবস্থার পেছনে এই অসংগঠিত অবস্থাও একটা কারণ হিসেবে রয়েছে।

চিনিকলের শ্রমিক কর্মচারি ও আখচাষীদের বছরজুড়ে উদ্বেগ

২০২১ সালে শ্রমিক আন্দোলনের একটা সক্রিয় খাত ছিল চিনিশিল্প। একই সঙ্গে এই খাতের কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে আখচাষীরাও এই আন্দোলনের নিকটবর্তী এক শক্তি ছিল।

সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণের অংশ হিসেবে কিছু চিনিকল বন্ধ ও বিক্রির উদ্যোগ নেয়ার খবরাখবরের মাঝেই এই খাতের শ্রমিক কর্মচারিরা আন্দোলনে নামে বছরের শুরুতে। বছর শেষেও এই আন্দোলনের কোন যৌক্তিক সমাধান হয়নি।

সরকার প্রাথমিকভাবে চিনিকলগুলো বন্ধের কথা বলেনি। লোকসানে জর্জরিত চিনিকলগুলোতে 'সংস্কার করা হবে' এমনটা জানিয়ে সরকার ছয়টি কলের আখ মাড়াইয়ের কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল। তখন কোন কোন সংবাদমাধ্যম সম্ভাব্য বন্ধের তালিকায় ৬টি কারখানার কথা লিখে। কোন কোনটি লিখেছে ৮ ও ১০টির কথা। শুরুতে ছয়টি চিনিকলে আখ মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করা হলেও উদ্বেগ তৈরি হয় যে সরকার সব চিনিকলই ধীরে ধীরে এভাবে বন্ধ করে দেয়ার পথে এগুচ্ছে কি না। বিশেষ করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হওয়া সত্ত্বেও পাটকলগুলো বন্ধের পর চিনি ও আখ খাতেও উদ্বেগ বাড়ে। তাছাড়া 'আখ মাড়াই বন্ধ' রাখা এবং মিল বন্ধ রাখার ব্যবধান সামান্যই।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন গঠিত হয়। পরে সুগার মিলস করপোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন দুটি একীভূত করে বিএসএফআইসি (বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন) গঠিত হয়। করপোরেশনের ১৫টি চিনিকল এবং তার অধীনে ১৯ হাজার ৮৯ একর জমি আছে। মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। এসব সুগার মিল হলো বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় খাতের কৃষিভিত্তিক একমাত্র শিল্প খাত।

চিনিকল সংকটের মূল দিকসমূহ

চিনিকল খাতে রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলোর একাংশ বন্ধ ও বিক্রির আওয়াজ ওঠে যখন লাভ-লোকসানের প্রচলিত

হিসাব কষা শুরু হয়। বলা হয়, 'এসব কারখানায় চিনির বিক্রয় মূল্যের চেয়ে উৎপাদন খরচ বেশি। এভাবে জনগণের অর্থের অপচয় করা উচিত নয়। এরকম লোকসানের সমাধান হলো এসব কারখানা বন্ধ করে দেয়া।' ২০২০ সালে (১৯ নভেম্বর) দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তখনকার ১৫টি সরকারি চিনিকলে বাজারদরের চেয়ে বেশি দামে উৎপাদিত হচ্ছিলো চিনি। তাতে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ৩ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা লোকসান গুনেছে করপোরেশন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে লোকসান ছিল ৯৭০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ৭ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা ব্যাংকঋণের দায় রয়েছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের ঘাড়ে। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও গ্র্যাচুইটি, ভবিষ্য তহবিল, আখের মূল্য ও সরবরাহকারীর বিল বাবদ বকেয়া পড়েছে ৫৫১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।'

চিনি খাতে বিরাষ্ট্রীয়করণের বাস্তব ফল কী দাঁড়াবে

লোকসানের কথা বলে রাষ্ট্রীয় চিনিকল বন্ধ বা বিক্রি করে দেয়া হলে কেবল যে এখাতের শ্রমিক কর্মচারিদের অসুবিধা ও ক্ষতি হবে তাই নয়– চিনির ভোক্তারাও তখন দীর্ঘমেয়াদে বেসরকারি মালিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবেন। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থে তখন বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা কোন সরকারের জন্য সহজ হবে না। চিনির বাজারে কর্তৃত্ব করবে বেসরকারি কারখানার মালিকরা ও বাজার সিন্ডিকেট। ২০২১ সালের শেষার্ধে বাজারে ইতোমধ্যে সেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। লাগামহীনভাবে চিনির দাম বাড়ছিল।

বিকল্প কী হতে পারতো

সুগার মিলগুলোর শ্রমিকরা নাম প্রকাশ না করার সত্ত্বে মিছিল সমাবেশে প্রায়ই বলেন–রাষ্ট্রীয় চিনিশিল্পে কথিত লোকসানের একটা বড় কারণ অদক্ষ প্রশাসন। অর্থাৎ মূলত ব্যবস্থাপনা সংকটে বিশাল বাজার থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় খাতের চিনিকলসমূহ ব্যবসায়ে মার খেয়েছে। প্রতিনিয়ত লোকসানের কথা বলা হলেও এটা বলা হতো না যে রাষ্ট্রীয় মিলগুলোতে ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরোনো যন্ত্রপাতির কারণে উৎপাদন সক্ষমতা কমে গেছে। এও বলা হয় না যে, প্রভাবশালীদের চাপে ও অনুরোধে প্রায় চিনিকলেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে জনবল বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন সময়। তাতে লোকসান বেড়েছে।

এই অবস্থার বুদ্ধিদৃপ্ত সমাধান হতো ব্যবস্থাপনায় এবং কারিগরী দিকে আমূল সংস্কার। যাতে কারখানাসমূহ লাভজনক হয়ে উঠতো। কিন্তু তা না করে বন্ধ করাকে সমাধান চিন্তা হিসেবে হাজির করা হতে থাকে দেশবাসীর সামনে। প্রচারমাধ্যমগুলোও এরকম প্রচারে বিশেষ উৎসাহী। অনেকে মিডিয়া হাউজের মালিকদের পরোক্ষে চিনির ব্যবসাও রয়েছে। বাকিদের রয়েছে বেসরকারি খাতের চিনি ব্যবসায়ীদের বিপুল বিজ্ঞাপন পাওয়ার হাতছানি।

বাংলাদেশের বাজারে বছরে ১৮ লাখ মেট্রিক টন চিনির চাহিদা রয়েছে। প্রতিষ্ঠার সময় সরকারি চিনিকলগুলোর বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ছিল ২ লাখ ১০ হাজার ৪৪০ মেট্রিক টন। সর্বশেষ গত ২০১৯-২০ মাড়াই মৌসুমে তারা এক লাখ টনেরও কম চিনি উৎপাদন করেছে। অর্থাৎ বিশাল বাজার থাকা সত্ত্বেও কারখানা সংস্কারের মাধ্যমে চিনি শিল্প কর্পোরেশন সেই বাজার দখল করেনি। সেটা উন্মুক্ত করে রেখেছে বেসরকারি খাতের জন্য এবং এখন নিজেদের সামান্য হিস্যাও বেসরকারি খাতকে ছেড়ে দিচ্ছে।

অথচ লোকসান কাটিয়ে লাভজনক হওয়ার একটা ভালো দৃষ্টান্তও ছিল হাতের কাছে। চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে চিনির পাশাপাশি আখের উপজাত দিয়ে জৈব সার, অ্যালকোহল, স্পিরিট, ভিনেগার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এসব উপজাত পণ্যের বদৌলতে তারা ২০১৯ সালে ১৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকা মুনাফা করেছে। আগের চার বছরও মুনাফা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

এসম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে চিনিখাত নিয়ে গবেষণাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা ২০২০-এর ২৫ ডিসেম্বর বিবিসিকে বলেন 'কর্তৃপক্ষ চাইলে চিনিকলগুলো সবক'টিকে লাভজনক করা সম্ভব। এতে করে দেশীয় এই শিল্পখাত আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেতো।' তিনি বলেন, সব খাতকে প্রণোদনা দিলেও আখচাষীদের কখনো প্রণোদনা দেয়া হয় না। সময়মত আখ কেনা, টাকা পরিশোধ করা, বীজের মান বাড়ানো, উন্নত বীজ/চারা দেয়া ইত্যাদি পুরো ভালোভাবে সমন্বয় না হলে আখের মান ঠিক হয় না। 'আর এগুলো ঠিক মতো করা হয় না বলেই সিস্টেম-লস হয়। পাশাপাশি জমির পরিমাণ ও মিলের সক্ষমতা কমেছে, যেগুলোতে কখনও দৃষ্টি দেয়া হয়নি।'

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য

দেশের চিনিকলগুলোতে শ্রমিক সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার। এ খাতের আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি হলো সরকারকে ৮টি চিনিকল বিরাষ্ট্রীয়করণ থেকে সরে আসতে হবে। কারণ এর চেয়ে ভালো সমাধান রয়েছে।

চিনিখাত: সর্বশেষ অবস্থা

আখ মাড়াই বন্ধ থাকায় ছয়টি চিনিকলে জরুরি যন্ত্রপাতিতে জং ধরে যাওয়ার খবর বের হচ্ছিলো বছর শেষের সংবাদপত্রে। ডেইলি স্টারে ২০২১-এর ২০ সেপ্টেম্বরের সংবাদে দেখা যায় পাবনায় মিল বন্ধ দেখে আখচাষীরা আখের উৎপাদনই বন্ধ করে দিচ্ছে। নিশ্চিতভাবে এসব সংবাদ বেসরকারি চিনি উৎপাদকদের জন্য সুসংবাদ হয়ে এসেছে।

দেশের চিনি বাজার বর্তমানে প্রধানত ৫টি ব্যবসায়ী গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা হলো সিটি গ্রুপ, দেশবন্ধু, মেঘনা গ্রুপ, এস আলম ও আবদুল মোনেম গ্রুপ। এরা মূলত পরিশোধিত চিনি সরবরাহ করে। যাদের সক্ষমতা রয়েছে ৩৩ লাখ মে. টন। বিদেশ থেকে অপরিশোধিত চিনি এনে নিজেদের মিলে পরিশোধনের পর বিক্রি করে মুনাফা করছে এসব ব্যবসায়ীরা। এরা আবার একই সঙ্গে অনেক ব্যাংকের মালিক এবং দেশের পত্রপত্রিকায় অন্যতম প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা।

আখচাষীদের আখচাষ বন্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি বছর শেষে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এও দেখা যায় বিভিন্ন সুগারমিলের শ্রমিক কর্মচারি সংখ্যা সমন্বয়ের নামে জনবল সংকুচিত করার চেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল নাটোরের লালপুরের চিনিকল শ্রমিকরা। অন্যদিকে, চিনিখাত নিয়ে সরকারের নতুন অবস্থানের কারণে আখচাষেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। যে সব চিনিকল বন্ধের তালিকায় রয়েছে– যেমন পাবনা, কুষ্টিয়া, শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জ ইত্যাদি চিনিকলের কাছে আখচাষীদের প্রায় ১০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। অন্যদিকে এসব মিলে রয়েছে প্রায় তিন হাজার কর্মী। এর মধ্যে যারা চুক্তিভিত্তিক কর্মী তারা স্থায়ীভাবে কাজ হারানোর শঙ্কায় ছিল বছরজুড়ে।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি

সর্বজনীন জাতীয় মজুরি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ধারণা ও কর্মসূচি হলেও বাংলাদেশে তার প্রচার কম, চর্চাও অনুপস্থিত। অথচ জনবহুল এই দেশে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক সুরক্ষা কৌশল হিসেবে এই কর্মসূচির বাস্তবায়ন অতি জরুরি। ২০০১ সালে সরকার এখানে বিভিন্ন আয়তনের শিল্পে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির একটা ঘোষণা দিয়েছিল। মালিকদের আপত্তি ও উদ্যোগে সেটা তখন স্থগিত হয়ে যায়। মালিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা মজুরির কোন ন্যূনতম সীমা থাকার বিপক্ষে। তাদের এই বিরোধিতার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। কারণ শ্রমিকদের যোগান বেশি থাকলে তখন অতিঅল্প মজুরিতেও লোক সংগ্রহ করা যায়।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরির বিরোধিতা করে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল একসময়। মজুরি নির্ধারণে পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কথা বলে উচ্চ আদালত এ-সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা স্থগিত ঘোষণা করে।

মালিকদের ঐ আপত্তির মুখে, এরপর থেকে, গত এক দশকে এ বিষয়ে আর নতুন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। যদিও এ বিষয়ে জাতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর সবারই একক দাবি রয়েছে। কোন কোন শ্রমিক ফেডারেশন ন্যূনতম জাতীয় মজুরি কত হওয়া উচিত সে বিষয়েও প্রস্তাব দিয়েছে বিভিন্ন সময়। শ্রমিক কর্মচারি ঐক্য পরিষদ ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টসহ অনেক জোট ও সংগঠন এরকম মজুরি ২০ হাজার টাকা হওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে বলে দাবি জানিয়েছে।

তাদের বক্তব্য, এরকম মজুরি নির্ধারিত থাকলে সার্বিকভাবে দেশের মজুরি কাঠামোর জন্য তা ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে কাজ করে। এটি থাকলে সব ধরনের শ্রমজীবী মানুষের মজুরির জন্য জাতীয় নিম্নসীমা খুঁজে পাওয়া সহজ ও সম্ভব হয়। যা দারিদ্র্য বিমোচনের সরকারি উদ্যোগেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরির একটা সর্বজনগ্রাহ্য কাঠামো খুঁজে পেতেই অতীতের সরকার ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে বলে দাবি করা হয়। এই বোর্ড ইতোমধ্যে অনেক খাতের জন্য ন্যূনতম মজুরির কাঠামো ঘোষণাও করেছে। তবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে কোন ঘোষণা এখনও বাকি আছে।

কোন কোন শিল্প খাতের মালিক সংগঠন বলতে চায়, খাতভিত্তিক মজুরি থাকার পর জাতীয় ন্যূনতম মজুরি থাকার দরকার নেই। শ্রমিক সংগঠকদের মতে, জাতীয়ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি থাকলেও খাতওয়ারি ন্যূনতম মজুরির সঙ্গে এর কোনো বিরোধ বাঁধার সুযোগ নেই। বিভিন্ন শিল্পখাতের ব্যাপ্তি ও সক্ষমতা অনুসারে সেই খাতের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়। আর জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রধানত সুবিধা দেবে অনানুষ্ঠানিক খাতের

শ্রমিকদের এবং জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বর্তমানে মজুরি বোর্ডের কোন সুরক্ষা পাচ্ছে না।

জাতীয়ভিত্তিক নিম্নতম মজুরি দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য নির্ধারিত হারে মজুরি প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতই বড় ও ব্যাপক। এই খাতের ভেতর ছোট ও মাঝারি অনেক অসংগঠিত উপ-খাত আছে– যেখানে লাখ লাখ মানুষ কাজ করছে কোন মজুরি-রক্ষাকবচ ছাড়া। তাঁদের মজুরির জন্য কোনো দিকনির্দেশনা নেই। একটি জাতীয় মজুরি থাকলে তাঁরা চাওয়া-পাওয়ার একটা ভিত্তি খুঁজে পাবে, যা আবার সংগঠিত খাতের জন্যও নিম্নতম মানদন্ড হিসেবে কাজ করবে। তা ছাড়া জাতীয়ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি থাকলে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মজুরি সমন্বয় করা যায়।

উল্লেখ্য, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিবেচনায় ২০২০ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্টে বলা হয়েছে 'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার বেলায় বাংলাদেশ সবার পেছনে। শুধু তা-ই নয়, এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দারিদ্র্যসীমার নিচে।' এই প্রতিবেদনের পর মহামারির আঘাতে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের মজুরি চিত্র আরও খারাপ হয়েছে।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তিনটি কনভেনশন আছে। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে তারা। আইএলও'র হিসাবে বিশ্বের প্রায় ৮০-৯০ ভাগ দেশে ন্যূনতম মজুরির মতো কর্মসূচি আছে। যদিও বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রূপে তার বাস্তবায়ন করছে। এত অধিক দেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নীতির বাস্তবায়ন প্রমাণ করছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য এই ব্যবস্থা কত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ দৈনিক প্রথম আলোতে মে দিবসে লিখেছেন: 'দেশের প্রতিটি নাগরিক কাজ করার মাধ্যমে নিরাপদে বাঁচার অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাদের সকলের একটি ন্যূনতম আয়সীমা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাস ভিত্তিতে এ রকম মজুরি– যার নিচে দেশের কোথাও কোনো কাজে কোনো মজুরি বা বেতন হতে পারবে না। যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে এই শর্ত পূরণ করতে হবে এবং এই মজুরি অবশ্যই বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পরিমাণ হতে হবে। সে জন্য তা দারিদ্র্যসীমার আয়ের নিচে হতে পারবে না।'

'বর্তমানে দেশে কোনো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নেই। শ্রমিকদের মধ্যে খাতওয়ারি কিছু ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা আছে। সেটাও সব প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হয়নি বা কার্যকর করার জন্য আন্দোলন করতে হয়। জাতীয় ন্যূনতম মজুরির অনুপস্থিতি, চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান বেশি থাকা এবং অসংগঠিত খাতের প্রাধান্যের কারণে সব পর্যায়ে মজুরি ও বেতনের ক্ষেত্রে সব সময়ই একটি নিম্নমুখী ঝোঁক বা টান থাকছে। ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত–যারা দেশে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের যোগান দেয়, সেখানে কোনো মজুরিবিধি নেই, সরকারেরও সে ক্ষেত্রে কোনো দায়-দায়িত্ব বা ভূমিকা দেখা যায় না।'

কীভাবে নির্ধারিত হবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

জাতীয় ন্যূনতম মজুরির বিতর্কে অংশ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন এরকম মজুরি কীভাবে নির্ধারিত হবে? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া আসলে কঠিন নয়।

বাঁচার জন্য একটা পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। তবে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আরও কিছু জরুরি বিবেচনাও কাজ করে। যেমন শ্রম বাজারের অবস্থা, উৎপাদনশীলতার ধরন ইত্যাদি। আইএলও তার ১৯৭০ সালের মজুরি সংক্রান্ত এক কনভেনশনে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকালে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য বলেছে:

- শ্রমিক পরিবারের বিবিধ চাহিদা;
- দেশের অন্যান্য খাতের মজুরি চিত্র;
- দেশের জীবনযাত্রার সাম্প্রতিক ব্যয় পরিস্থিতি;
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের পরিসর ও ধরন;
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় জীবনযাত্রার ধরনে ফারাক;
- উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত বিবেচনা;

এরকম বিবেচনাগুলো বাংলাদেশের শ্রম আইনেও কমবেশি আছে। এখানেও মজুরি নির্ধারণে এরকম বিবেচনাসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা আছে। মজুরি বোর্ডে ত্রিপক্ষীয় বিবেচনায় সেটা কমবেশি অনুসরণও হয়। আবার সরকার মজুরি বোর্ডের সুপারিশকে পুনর্বিবেচনার জন্যও বলতে পারে। মজুরি বোর্ড তখন সেটা আবার পুনর্নির্ধারণের জন্য বসে। এভাবেই পাঁচ বছর পরপর বিভিন্ন খাতে মজুরির গেজেট হয় এখানে। মজুরি নির্ধারিত হয়নি এমন খাতও রয়েছে এখনও বহু। শ্রম অধিদপ্তরের হিসাবেই দেশে ৬৫-এর বেশি শ্রম খাত রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত ২০২০ থেকে নিয়ম করেছে খাতভিত্তিক মজুরি কাঠামোর বাইরেও জাতীয়ভাবে কোন অবস্থাতেই দৈনিক ১৭৬ রূপির কম মজুরি দেয়া যাবে না। এই মজুরি হবে কেবল আট ঘন্টা কাজের দৈনিক হিসাবে। আগের বছর আগস্টে লোকসভায় এই বিধান অনুমোদন করে তারা।

পাশের দেশের এই অভিজ্ঞতা এবং দেশের ভেতরকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির পাশাপাশি বাংলাদেশেও এখন জাতীয়ভিত্তিক একটা ন্যূনতম মজুরি-মানদন্ড চাইছে শ্রমজীবীরা। যা বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহের বাইরের শ্রমজীবীদের কিছুটা সুরক্ষা দেবে দরকষাকষির সুযোগহীন মজুরি বাজার এবং অবিশ্বাস্য উর্ধ্বগতির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে। এরকম সুরক্ষা ছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী সমাজকে দারিদ্র্য পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটানো কঠিন হয়ে পড়ছে সরকারের জন্য। এছাড়া শ্রমজীবী পরিবারগুলো যদি প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে ব্যর্থ হয় অনিবার্যভাবে তাদের শ্রম দানের সক্ষমতাও হ্রাস পাবে। যা জাতীয় উৎপাদনশীলতার জন্যও খারাপ বার্তা। মজুরির জাতীয় একটা মানদন্ড (এবং একই সঙ্গে কর্মঘন্টার একটা জাতীয় সীমা) করা গেলে যে খাতের শ্রমিকই হোক না কেন, জাতীয় মানদন্ডে নির্ধারিত অংকের নিচে কাউকে স্বল্প মজুরি দিয়ে আর দারিদ্র্য অবস্থায় ঠেলে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ জাতীয় ন্যূনতম মজুরি দরকার জাতীয় স্বার্থেই। একইভাবে কাজের শোভন পরিবেশের স্বার্থে শ্রমঘন্টা নির্দিষ্ট করাও জরুরি।

সর্বজনীন পেনশন নিয়ে অনিশ্চয়তা

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী-প্রবীণরা অসহায়

উপমহাদেশে পেনশন ব্যবস্থা চালু হয় গত শতাব্দির শুরুর দিকে। বাংলাদেশে মূলত সামরিক বেসরকারি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারিরা পেনশন পান এবং সেটা তাদের দেয়া হয় জনগণের করের অর্থ থেকে। সৌভাগ্যবান এই মানুষরা দেশের চাকুরিরত মানুষের সামান্য অংশ মাত্র– ১৪ লাখের মতো। এই জনগোষ্ঠীর অবসরভাতা দিতে সরকারের খরচ হয় রাষ্ট্রীয় ব্যায়ের প্রায় ৮-৯ ভাগ।

অন্যদিকে বেসরকারি খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ক্ষুদ্র এক অংশ গ্রাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পান। এর বাইরে কয়েক লাখ বয়স্ক মানুষ সরকারের কয়েক শ টাকার বয়স্ক ভাতা পান। দুঃস্থ নারী এবং গর্ভবতী মায়েরাও এক ধরনের ভাতা পান। যদিও তা টাকার অঙ্কে সামান্য। এরকম সবাই মিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেটা দেশের বয়স্ক জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

বাংলাদেশে ৬৫-এর বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা ৮০-৯০ লাখ। ৬০-এর বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা এক কোটির বেশি। এরকম প্রবীণ জনগোষ্ঠীর হার দ্রুত বাড়ছে দেশে। মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্যও ক্রমে বাড়ছে। অর্থাৎ বৈশ্বিক মানদন্ডে বর্তমানে ৬৫ উর্ধ্ব মানুষের হিস্যায় বাংলাদেশ কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও শিগগির অবস্থা পাল্টে যাবে।

এরকম মানুষদের বড় অংশ জীবনভর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা মানুষ। সরকারি চাকুরি করে প্রবীণ হয়েছেন এমন মানুষ মোট প্রবীণের অতি নগণ্য অংশ। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণই কর্মজীবন শেষে পেনশনধর্মী কিছু পাচ্ছেন না। কর্মজীবন শেষ মানেই এরা আর্থিকভাবে সুরক্ষাহীন। যারা বয়স্ক ভাতা বা অনুরূপ কোন ভাতা পান– সেটাও পেনশনের বিকল্প হওয়ার মতো নয়, মাত্র কয়েক শ টাকা পাওয়া যায় তাতে। তাতে ২-৪ দিন চলা যায় মাত্র। ফলে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মূল অংশ কার্যত স্থায়ীভাবে আর্থিক ঝুঁকিতে থাকেন শেষ বয়সে।

একটি দেশে এভাবে কোটি কোটি মানুষের আর্থিক নিরাপত্তাহীন জীবন রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের এক নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে। এই বাস্তবতাতেই বহু বছর বাংলাদেশে সর্বজনীন পেনশন নিয়ে কথা হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বের অর্থমন্ত্রীরাও বিভিন্ন সময় ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ২০২১-এর জানুয়ারিতে সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানও বলেছিলেন, সাংবাদিকসহ দেশের সব নাগরিককে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষ পেনশনের আওতাভুক্ত হবেন।'

সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে 'সাম্য' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ স্বপ্নের কথা বলেছিলেন দায়িত্বে থাকার সময়।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদও বলেছিলেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' চালুর জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। এসব অভিমতের পরও বিষয়টি কার্যকর হওয়ার মতো কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বাস্তবে দেখা যায়নি। বিশেষ করে ২০২১ সালের বাজেটকালেও বিষয়টি অনুচ্চারিত থেকে যায়।

সর্বজনীন পেনশনের ধারণায় কীভাবে সবাই লাভবান হয়

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং হচ্ছে। এর একক কোন মডেল নেই। বাংলাদেশে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় সর্বজনীন পেনশনের ধারণার একটা সাধারণ রূপ হিসেবে যা বেরিয়ে এসেছে তাহলো যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন তারা জাতীয়ভাবে গঠিত একটা তহবিলে নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ দেবেন। যারা তাদের কাজে নিচ্ছে সেই মালিক গোষ্ঠী তহবিলে কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে থাকবে। যারা নিজেরা সেলফ এমপ্লয়েড তারা এবং সরকারও এতে নির্দিষ্ট হারে অর্থ যোগ করবে। এভাবে যে তহবিল হবে সেটি বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হবে। যেসখানেও কিছু অর্থ যোগ হবে। এরপর তহবিলের একজন সদস্য যখন অবসরে যাবে তখন তিনি তহবিলের সদস্য হিসেবে হিসাবমতো সুবিধা পাবেন।'

একই বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ ২০২১ সালের ২৯ মে দৈনিক প্রথম আলোতে যে প্রস্তাব রেখেছেন তার চুম্বক অংশ ছিল এরকম:

জাতীয় পরিচয়পত্রধারী সব নাগরিকের দেশে একটা টিআইএন থাকতে পারে। থাকতে হবে একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরও। প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিককে প্রতিবছর ন্যূনতম একটি অঙ্কের আয়কর বা জাতীয় পেনশন প্রিমিয়াম দিতে হবে, যা নিম্নতম পর্যায়ে আয়ের ১ থেকে ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এ কন্ট্রিবিউশন সরাসরি তাঁদের পেনশন কন্ট্রিবিউশন হিসেবে পেনশন ফান্ডে জমা হবে। অন্যান্য নানা আয়ের মানুষের দেয় আয়করের একটি অংশ তাদের পেনশন কন্ট্রিবিউশন হিসেবে সরকারের পেনশন ফান্ডে চলে যাবে। আয়কর থকে পেনশন তহবিলে স্থানান্তরের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৫ শতাংশ। আয়করের পেনশন কন্ট্রিবিউশনের আনুপাতিক হারে কর প্রদানকারী কর্মজীবন শেষে পেনশনপ্রাপ্ত হবেন। এভাবে জনসংখ্যার ২৫ বছরের নিচের এবং ৬২ বছরের ওপরের অংশ বাদে সবাই এ প্রিমিয়াম বা ট্যাক্স নেটে আসবেন। এভাবে দেশের কমবেশি পাঁচ কোটি মানুষ প্রতিবছর সরকারকে কর দেবে এবং পেনশন তহবিলে কন্ট্রিবিউট করবে। জনপ্রতি গড়পড়তা ৫০০ টাকা ধরলেও তা হবে বছরে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সরকার আয়করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এভাবে প্রতিবছর ৫ হাজার কোটি করে পাঁচ বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি করে সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা যায়।'

উপরোক্ত প্রস্তাবের মতো অন্যান্য সকল প্রস্তাব ও সুপারিশ সমন্বয় ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সর্বজনীন পেনশন যে হতে পারে সে বিষয়ে পূর্বে একাধিক অর্থমন্ত্রী জাতীয় বাজেটকালে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপনকালে বলেছিলেন 'অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত প্রত্যেকের জন্য পর্যায়ক্রমে পেনশন ব্যবস্থা চালুর জন্য শিগগির 'ইউনিভার্সাল পেনশন অথরিটি' গঠন করা হবে। কিন্তু এ বিষয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ কাটেনি ২০২১ সালেও।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদও বলেছিলেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' চালুর জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।

কেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মানুষের জন্য পেনশন বেশি জরুরি

বৃদ্ধ বয়সেও কায়িক পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এমন প্রবীণের সংখ্যা এখন শহর-গ্রামে কম নয়। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের আগেই প্রবীণ জনগোষ্ঠির সংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়ে যাবে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এ কে এম নুর-উন-নবী কয়েক বছর আগে বিবিসিকে এক হিসাব কষে দেখিয়েছিলেন, ২০৪৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় প্রবীণদের সংখ্যা বেশি থাকতে পারে। সেসময় প্রবীণ জনগোষ্ঠির সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে চার কোটি। এর বিশাল প্রভাব পড়বে শ্রমবাজারের ওপর। তরুণ-তরুণীরা পরিবারের প্রবীণদের ভরণপোষণ করে নিজেদের চালাতে হিমশীম খাবে। ২০১৮ সালে কাজে যোগ্য মানুষ (১৪-৫৯) ছিল জনসংখ্যার ৪৩ ভাগ। আর ৬৫ উর্ধ্ব মানুষ ছিল ৭ ভাগ। ২০৫০ সাল নাগাদ শেষোক্ত মানুষদের হিস্যা দাঁড়াতে পারে ২৫ ভাগ। আজকের ধাঁচের অর্থনীতিতে জনসংখ্যার এত বড় অংশ প্রবীণ হলে এবং তাদের পেনশন সুবিধা না থাকলে সমাজে দারিদ্র্য পরিস্থিতি এক নাজুক মাত্রায় উপনীত হতে পারে। এখনি ৬৫ উর্ধ্বদের মাঝে দারিদ্র্যের প্রকোপ প্রায় ২৫ শতাংশ। এরকম ভবিষ্যতে বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পরিবারগুলোর অবস্থা কঠিন হয়ে উঠবে। দারিদ্র্যের কারণে এদের অনেকের নিত্যদিনের মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে উঠছে এবং আরও উঠবে। এখনি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত পরিবারগুলোতে ৫৫ উর্ধ্বদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার কম। কারণ তাদের দিয়ে তখন 'মালিক'রা কাজ করাতে চায় না। এরকম মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা তথা পেনশনের মতো কর্মসূচি অপরিহার্য।

একজন রিকসা চালক কিংবা একজন ক্ষুদ্র দোকানদার সারা বছর পরিশ্রম করে এবং অর্থনীতির সচলতায় যুক্ত থেকেও জীবন সায়েহ্নে কেন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় থাকবেন এবং অপরের বোঝা হবেন? কোটি কোটি কৃষক যুগের পর যুগ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি হয়ে কেন পেনশনধর্মী কোন সুবিধা পাবেন না? এরকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়েই সর্বজনীন পেনশনের ধারণার চর্চা ও অনুশীলন চলছে বিশ্ব জুড়ে।

জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে শ্রমজীবীরা দিশেহারা

নিরুপায় হয়ে শহরে

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তালিকার উপরের দিকে আছে। সে হিসাবে নীরবে ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে। এখানকার শ্রমজীবীরাই হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান সরাসরি শিকার। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা, পুনর্বাসন উদ্যোগে তাদের নিয়ে উদ্বেগ ও আলাপ আলোচনা একেবারেই কম। প্রায় অনুপস্থিত। ২০২১ সালও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মহামারির কারণে এ বছরের প্রথম দিকে এরকম উদ্বাস্তুদের চলাচল সীমিত থাকলেও লকডাউন উঠে যাওয়ার পর সেটা শুরু হয়েছে। শহরগুলোতে এরকম উদ্বাস্তুদের আগমন বিশেষ গতি পেয়েছে এখন বলা যায়। বস্তি এলাকাগুলো আবার মানুষের ভারে উপচে পড়ছে।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে চলতি শতকে বিশ্বের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৬০ কোটি মানুষ হুমকির মুখে রয়েছে। বর্তমানে প্রায় চার কোটি মানুষ প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পুরানো বসতি ছাড়া হচ্ছে। সহিংসতা, সংঘর্ষ ইত্যাদির চেয়েও এখন মানুষ এলাকা ছাড়া হচ্ছে মূলত আবহাওয়ার কারণে।

আবহাওয়ায় তাপ বাড়া, খরা, বন্যা ইত্যাদির পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আগামীতে উদ্বাস্তু সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ক্রমাগত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের আশঙ্কা ছড়াচ্ছে। সম্ভাব্য ঐ উদ্বাস্তু মানুষদের বড় অংশ থাকবে এশিয়া ও আফ্রিকায়। যার মধ্যে, অ্যামেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন নামের একটা সংস্থা তাদের এক গবেষণায় অনুমান করেছে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ায় অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিপুল শ্রমজীবীকে উদ্বাস্তু হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এরকম মানুষের সংখ্যা হতে পারে লাখ লাখ।

উল্লিখিত সংস্থার গবেষণাটি বলছে, উদ্বাস্তু শ্রমজীবী অভিবাসীরা এখানে প্রথমে রাজধানীমুখী হবে। কারণ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের মূলকেন্দ্র ঢাকা। তাতে করে রাজধানীতে জনসংখ্যার চাপ বাড়বে। জনসংখ্যার এ চাপের কারণে একসময় অনেকে রাজধানী ত্যাগও করবে। তখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ প্রবেশ করবে।

তবে বাংলাদেশে দ্বিতীয় পর্যায় এখনও শুরু হয়নি। সর্বশেষ চিত্র হিসেবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামে লোকসংখ্যার চাপ ক্রমাগত কমছে। আর উল্টোদিকে শহরগুলোতে সেটা তীব্রভাবে বাড়ছে। অর্থাৎ আবহাওয়াজনিত জনসংখ্যার স্থানান্তর এখানে শুরু হয়ে গেছে বলা যায়।

অন্যদিকে, ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার ২০২১ এর ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন উদ্বৃত করে লিখেছে, ২০৫০-এর মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায়

১ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে পুরানো ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় পেতে হবে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ৩৭ ভাগ হবে বাংলাদেশের।

এ অবস্থার বড় এক কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষিতে কর্মসংস্থানজনিত সংকট। প্রকৃতি উদ্বাস্তু সংকট তীব্র করছে এবং করবে আরও। অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন সাগরের জলের উচ্চতা বাড়ার কারণে নোনাপানি উপকূলীয় এলাকা ছাপিয়ে গোপলাগঞ্জ পর্যন্ত এসে পড়েছে। এর আগেই খুলনা বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুরসহ দক্ষিণের অনেক জেলা লবণ পানির গ্রাসে পড়েছে। এতে কৃষি নষ্ট হচ্ছে, ফসলি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে। যাঁরা কৃষির ওপর নির্ভরশীল তাঁরা পেশা খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় মানুষ খাবার পানির সংকটে পড়েছে। বিশুদ্ধ খাবার পানি ছাড়া কোথাও দীর্ঘদিন বসবাস করা যায় না। আবার প্রতিনিয়ত অবস্থা খারাপই হচ্ছে।

বিবিসি ২০২১-এর ১৫ সেপ্টেম্বর তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ১৯৮০ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত বছরে গড়ে ১৪ দিন তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে। আর ২০১০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রতি বছরে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বছরে ২৬ দিন। তার মানে জলবায়ুতে পরিবর্তন একটা রূঢ় বাস্তবতা এখন। আর এই পরিবর্তনের ফলাফল দেখতে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি বিশ্ববাসী তাদের ভোগের ধরন না পাল্টায় এবং প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা না করে।

বর্তমান হারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়তে থাকলে কেবল জলবায়ু পাল্টানোই নয়– ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১২০ কোটি মানুষ তাপমাত্রাজনিত শারীরিক নানান ক্ষতির মুখেও পড়বে। এরকম ক্ষতিও বেশি হবে শ্রমজীবীদের। কারণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের অনেক সময় রোদেপুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে যেতে হয় দীর্ঘসময়। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীরাও তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত ক্ষয়ক্ষতির শিকার কম নয়। বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের উৎপাদনশীলতার একটা বড় ক্ষতি হচ্ছে তাপমাত্রা বাড়ায়।

দৈনিক প্রথম আলো ২০২১-এর ৬ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে বিশ্বে ঢাকাবাসীর কর্মক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কমেছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে এ শহরের শ্রমজীবীরা স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার চেয়ে কম কাজ করতে পারছে। কাছাকাছি অবস্থা কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জের। সাধারণত কোন শহরের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রীর বেশি হলে তাকে চরম উষ্ণ বলা হয়। জনসংখ্যা বাড়ার কারণে বাংলাদের শহরগুলোতে গাছপালা কমছে। বাড়ছে কংক্রিটের কাঠামো এবং আবহাওয়াও 'চরম' রূপ নিচ্ছে নীরবে।

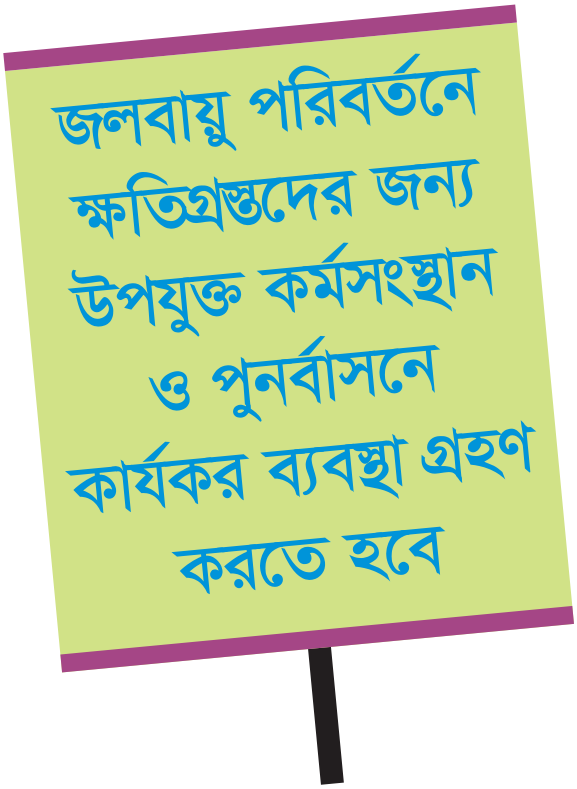

দ্বীপ থেকে বস্তিতে

ঢাকায় কীভাবে জলবায়ু উদ্বাস্তুরা আসছে তার একটা উদাহরণ দিয়ে ডয়েচ ভেলে লিখেছে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলকায় একটি বস্তির নাম ভোলাপাড়া। বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা ভোলার বিভিন্ন এলাকায় যাঁরা নদী ভাঙনের শিকার, তাঁরা এখানে এসে আশ্রয় নেন। এই বস্তিতে ভোলা থেকে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে আসা কয়েকশ' পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। তাই এই বস্তির নাম হয়ে গেছে 'ভোলাপাড়া'। তাঁরা গত কয়েক বছর ধরে আসছেন। কেউ আবার ঢাকার অন্যান্য বস্তিতেও চলে গেছেন। তাঁদের সূত্রে ভোলা থেকে যাঁরা নদী ভাঙনের শিকার হয়ে ঢাকায় আসেন, ঢাকায় তাঁদের প্রথম ঠিকানা এখন এই ভোলাপাড়া বস্তি।

ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার নামের একটা সংস্থা জানিয়েছে আগামীতে বাংলাদেশে বছরে গড়ে বন্যায় প্রায় ১০ লাখ, ঘূর্নিঝড়ে প্রায় ১০ হাজার, সুনামি ও ঝড়ো বাতাসে আরও প্রায় এক লাখ মানুষ বসতি হারিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হতে পারে। এর বাইরে ভূকম্পনের মতো ঘটনা পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এই উদ্বাস্তুরা যাবে কোথায়? থাকবে কোথায় এবং এদের কর্মসংস্থানের উপায় কী? এদের একাংশ প্রতি বছর রাজধানীতে আসতে থাকবে হয়তো। ঢাকা কী এদের পুনর্বাসনের জন্য আদৌ প্রস্তুত? কত ভোলাপাড়া ধারণ করবে এই রাজধানী? সবচেয়ে উদ্বেগের দিক হলো এরকম উদ্বাস্তুদের ধারণ করতে যেয়ে শ্রমবাজারে শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতাও কমতে থাকবে। এর ফলে তৈরি হবে দারিদ্র্যের নতুন দুষ্টচক্র। ইতোমধ্যে অর্থনীতিবিদরা দেশে ক্রমাগত 'নতুন দরিদ্র'দের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা জানাচ্ছেন। এই নতুন দরিদ্রদের বড় অংশ বাস্তবে জলবায়ু উদ্বাস্তু।

বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে অনেক করণীয়ের কথা বলছেন। যার মধ্যে আছে প্রাথমিক ও স্থায়ী পদক্ষেপ হিসেবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর কথা। বাংলাদেশের পরিবহন খাত, শিল্পখাত, বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুত কেন্দ্র, ইটেরভাটা ইত্যাদি কার্বন নিঃসরণের বিপুল উৎস হয়ে আছে। এসবের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা আরও দুটি বিশেষ সুপারিশও করছেন।

প্রথমত বাংলাদেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ধরনকে প্রকৃতিবান্ধব করে তোলা; সুন্দরবনসহ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর বাড়তি সুরক্ষা। দ্বিতীয়ত শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে উন্নয়ন উদ্যোগ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাড়ানো এবং তাদের কর্মসংস্থানধর্মী পুনর্বাসনে অধিক মনযোগী হওয়া। কিন্তু এর জন্য যেভাবে জাতীয় সম্পদ সমাবেশ করা দরকার সেটা কী বাংলাদেশ আদৌ করছে?

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় শ্রমজীবী পরিবারের শিশুরা

শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ জলবায়ু পাল্টালে শিশুদের উপর তার কী প্রভাব হবে সেরকম এক গবেষণা শেষে ২০১৯-এ বলেছিল, বাংলাদেশে এক কোটি নব্বই লাখেরও বেশী শিশুর জীবন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সরাসরি ঝুঁকিতে রয়েছে। এদের বড় অংশ শ্রমজীবী পরিবারের শিশু। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা ফোর সঙ্গে এও বলেছেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেশি ঝুঁকি তৈরি করছে। তারা শিশুদের পর্যাপ্ত খেতে দিতে পারছে না, তাদের সুস্থ রাখতে পারছে না। তাদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।'

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির অর্থ হল আক্রান্ত পরিবারগুলো আগের চেয়েও বেশি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। যখন তারা ঘরবাড়ি হারায় তখন সেসব পরিবারের শিশুরা অর্থ উপার্জনের জন্য কোন কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়। হারিয়ে যায় তাদের শিক্ষা জীবন। মেয়েদের বাল্যবিয়েরও বড় এক কারণ জলবায়ুজনিত বিপর্যয়। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মূলত দেশটির শ্রমজীবীদের জীবনে দারিদ্র্যকে এক স্থায়ী লিখন করে তুলছে।

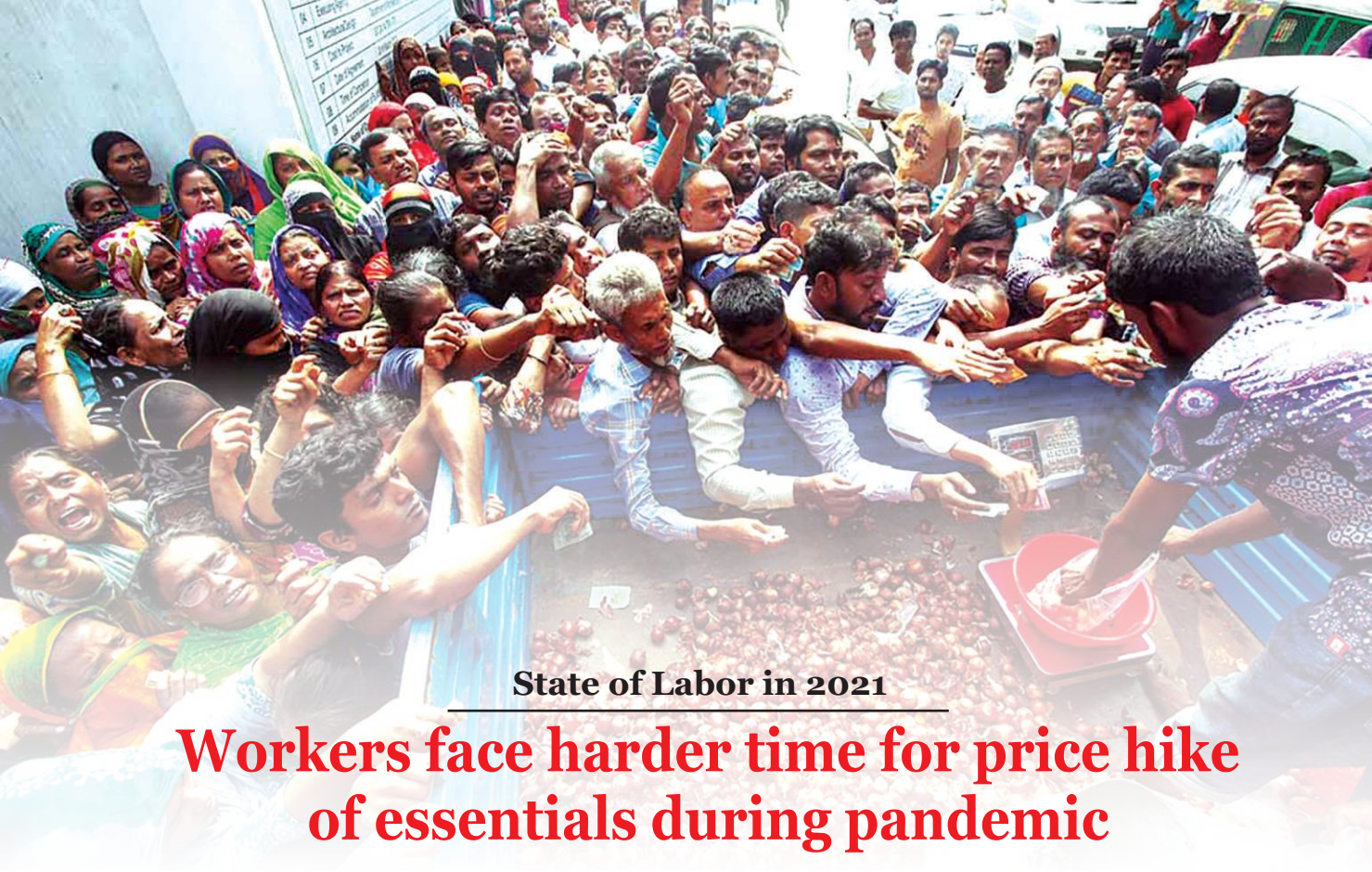

State of Labor in 2021

Workers face harder time for price hike of essentials during pandemic

Workers will remember the year 2021 for a long time as they faced harder time than ever in Bangladesh. They have seldom experienced such a long bad time in recent history. The previous year's sufferings has been added to the 2021 miseries during Covid-19 pandemic. Workers and their families were distressed due to constant lockdowns, unemployment, and financial crises. At the end of the year, even though the workplace became normal, many who lost their jobs were not able to get back their previous position. Moreover, incredible price hikes of daily commodities have put them into further horrible situation. Many workers were heavily indebted to the two-year long pandemic. The unbridled state of commodity prices has made their indebtedness more miserable.

Year of declining income-expenditure-consumption of workers

The main topic of Bangladesh in 2021 is certainly the spread of the Covid-19 pandemic and the apparent relief from it. Week after week this year, the unemployed were compelled to spend their time in 'lockdown'. Self-employed could not go to work. Many temporary workers have been laid off. It was a year of declining production due to falling demand and marketing. As a result, millions of people became unemployed. As trade and commerce shrink, labor prices fall, and so does the ability of workers to negotiate. Their income, expenditure, and consumption-everything declines at this time.

The first Covid-19 case was detected in Bangladesh in March 2020. And its spree continued slowly even at the end of 2021. In two years, millions of Bangladeshis have had to be diagnosed with the coronavirus. Among them, 1.6 million people have been infected with the virus. Around 28,000 people have died according to the government statistics. A large part of the dead was working people of the society. As the virus is generally spread from person to person, people who had no

alternative to go out for work were more likely to be infected. Many working families suffering from Covid-19 become over-indebted to cover their medical expenses. Many have left the city and taken shelter in villages at the beginning of the year. Some were returning to the city at the end of the year.

The unemployment of educated people is at an incredible level

A number of non-governmental organizations have conducted surveys on the rise in unemployment during Corona in 2021 and the previous year. In the first quarter of 2021, Bangladesh Bank published a research report conducted in the last year. The report mentioned that more than 2.6 million people have lost their jobs during Corona pandemic. Since Corona continued the following year, it is obvious that those unemployed did not find work at the beginning of 2021. According to the central bank's findings, the dismissal rate in the industrial sector was 5.7 percent due to the impact of Covid-19. A survey on young people conducted by the BRAC Institute of Governance and Development in January last year found that 15 percent of young people who had been employed before the pandemic had lost their jobs after the Covid-19 spread. Menace of unemployment has grasped even the highly educated people. In the recent 41st BCS, the number of applicants for the nearly 2200 vacancies has been around 0.5 million. In other words, more than two hundred young people are applying for one post. In the 43rd BCS, there were 244 candidates for each post. It means 243 people will be left out in this war. It is anticipated that the uncertainty of such young people will increase in 2022 beyond 2021.

Bangladesh ranks 76th in the world hunger index

Prolonged unemployment and hunger always go hand in hand. Bangladesh ranks 76th place in the world hunger index this year. It's one step down from last year. Neighboring Myanmar was also five steps ahead of Bangladesh in this year's index. The score on this index 'zero' means there is no hunger. If the score is '100' then the level of hunger should be understood as maximum. Bangladesh's position is a bit better than the 'critical' stage. According to the index, the height of 28 percent of children under the age of 5 in Bangladesh is still lower than normal. This tendency is usually seen among the children of working families in slum areas. If the problem of shortness in height is passed down from generation to generation, then it must be said that these poor families are entering into a vicious circle of Dwarfness.

Leap in the price hike of commodities

One of the major reasons why the poor eat less or get less food is the increase in food prices compared to income. In 2021, fine and medium types of rice were sold at 12 percent and coarse rice at 13 percent more than the same period last year. From the beginning to the end of the year, the price of rice has always been on the rise. Compared to the previous year, rice of different quality has been sold at a minimum of Tk. 5 per kg and above Tk. 15 per kg higher. The price of flour has also increased by at least 5 Tk. per kg. The price of pulses has gone up by Tk 20 per kg.

The price of broiler chicken has increased by Tk. 70-80 per kg as compared to last year. Similarly, the prices of oil, onion, sugar, etc. have also gone up. The real wages of the workers are reduced as the prices of essential commodities are gradually increased while the wages are stable. Such an uncontrolled increase in commodity prices has made the condition of working families miserable in 2021. This increase in commodity prices has taken place even before the rise in fuel prices.

At the end of the year, under the pretext of increasing the prices of diesel and kerosene, the owners and workers of the transport sector used the weapon of strike and increased the passenger fare by around 30 percent. In a sudden announcement on November 3, the price of diesel and kerosene was increased by 23 percent. In response to this, the prices of almost all the essential commodities have gone up again.

The number of millionaires is increasing rapidly

During the Covid-19 pandemic, the income of most of the middle class and poor people including the workers of the country was reduced. On the other hand, the income of a small group increased drastically. Some of them have entered their names in the millionaire's book. According to Bangladesh Bank, during the Covid-19 pandemic, the number of millionaire bank accounts in the country has increased by more than 11,500 in the last year, which is faster growth than usual (July 25, 2021; Kaler Kantho).

At the end of March 2021, the number of millionaire depositors in the country's banks had increased to 94,272. From March 2019 to March 2020, there were only 6,349 millionaire depositors in the country. And in the whole period of 2020, there was an increase of 1051 millionaire account holders. This means that the number of millionaire depositors has increased the most during the Corona period.

It is to be noted that before the Covid-19 pandemic, the income of the upper 10 percent of the people in the society of Bangladesh was more than the income of the lower 40 percent of the people. At the beginning of 2020, the poor population in Bangladesh was about 33.4 million. Obviously, in 2021, wealth and class inequality has increased in society.

Priority for vaccination was not given to all sectors' workers

The latest big picture of inequality between the rich and the poor, especially against the working class in Bangladesh has been seen during the vaccination of Covid-19. The government was trying to keep the labor-intensive sectors running even amid the Covid-19 emergency. Although these sectors were fully reopened after the lockdown, workers were not initially given priority in vaccination. Later, in response to the demands of the trade unions, an initiative was taken to provide emergency vaccinations to the garment workers, but this did not happen in any other sector.

The total number of workers active in economic activities in the country is estimated to be 63.5 million. Of these, 12.5 million are working in the formal sector, according to the daily Samakal on August 2, 2021. But in response to the demands from garment leaders, workers in this sector have been vaccinated, but the uncertainty about vaccinations for other export and industrial workers has not abated since the end of the year.

The number of new poor is increasing

Although the spread of Covid-19 was not found severe at the end of 2021, the infection and death did not stop fully. In addition, new versions of the virus are occasionally detected in neighboring India. In the meanwhile, economic activities have started across the country. However, despite the increase of pressure of demand and consumption in the post- Covid pandemic, labor demand does not seem to have increased. In particular, the incredible rise in fuel prices has created unprecedented pressure on the economy.

Just before the rise in the fuel prices, BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) and the Power and Participation Research Center (PPRC) conducted a joint survey which shows that due to Covid-19 the number of new poor people in the country was 24.5 million in March 2021, six months later it stood at 32.4 million. According to the survey report, 28 percent of the country's population migrated from urban to rural areas during the pandemic. Of those, 18 percent have returned to the city. 10 percent of the people have not yet returned to the city.

2021 sees less-movement in labor sector

The long-term movement this year was only seen in the jute mill sector. The laborers were engaged in continuous procession and meetings claiming the arrears of wages of some of the laid-off jute mills. These workers were also demanding the reopening of closed factories. Apart from this, there have been isolated movements in some other garment factories including the Style Craft factory of Gazipur. The workers of Style Craft continued their movement in front of Shram Bhaban at Bijay Nagar of the capital since November demanding their arrears. Apart from these, the labor sector was systematically devoid of movement in 2021. This status of non-movement was not due to wage and job satisfaction. It was due to the instability of the political situation. The inertia in the political environment also impacts the activities of labor rights organizations.

Apart from making statements on labor accidents, no long-term action made by the mainstream political parties in the interest of workers has been visible nationally. As an exception to this, some leftist parties have been seen trying to organize workers in different sectors. But they also failed to raise the wave of any movement nationally.

Exports increases, but labor wages static

Against the status of non-movement in the labor sector, a different scenario has been seen this year. That is the increase in export earnings in various industries, but it has not had a positive effect on the wage deprivation of workers in those sectors.

For example, the tea sector has produced a record amount this year. But the wages of tea workers were almost the lowest among the industrial workers of the country. According to the daily Ittefaq on November 3, 2021, in the first four months of this fiscal year (July-October), the income has increased by 13.33 percent against the target of export income. Besides, the growth has been 22.72 percent as compared to the same period of last financial year. But at the same time, there was no official increase in the wages of the workers

Climate migrant workers on the rise

Another emerging silent change that has been noticed in the labor sector in 2021 is an increase in the number of climate migrant workers. Unusual changes in the seasonal cycle of the country's climate have become particularly visible this year. As a result, problems were being created in the old method of rural cultivation. Which was creating additional unemployment there. As soon as the lockdown of Covid-19 lifted, more and more climate refugees were seen moving from villages to cities.

Workplace ordeals of coal workers

[Workplace ordeals and rights of coal workers are discussed a little bit in Bangladesh. Prothom Alo published a report on November 4, 2021 revealing awful working environment of coal workers which has been presented here briefly to create awareness and find out a way out in this regard.]

Amin Bazar in Savar is adjacent to the megacity Dhaka. Unloading coals from ships is a very common scenario every day around Borodeshi village where hundreds of workers are working.

From September to April- coal is unloaded from ships at four ghats (Dwipnagar, Keblarchar, Korean, and Namar ghat) on the Turag River in Gabtali and Aminbazar area. This coal goes to the brickfields of Dhaka and nearby districts. About 10,000 workers are involved in unloading the coal from the ship and uploading it on the truck. Most of them returned to the village at the end of April.

Most of the coal workers do not know whether there is any special health risk in it. They never heard of anything like this. They only know to work their fingers to the bone. At the end of the day, they find no strength to move. No one even looks for them. It can be called a primitive world of slavery.

Experts say that harmful dusts enter the body of coal workers in three ways. Since no special type of mask is used, it enters directly through the mouth. It also enters the body during breathing and through the hair follicles. Thus workers are facing extreme health risks, including risk of cancer and dyspnea. During visiting the workplace, no one is seen using any safety equipment.

Unloading coal from ships provides a bit more wages than other daily labor. That is why workers come to Dhaka from different parts of the country during the coal unloading season. Those who come with their families rent low-cost houses in Aminbazar and lower areas around Gabtali. Most of their children do not go to school. The workers who come alone stay in the temporary mess made by the labor chiefs.

Some coal workers shared that they were not interested in the education of their children for two reasons. First, the poverty in the family. They want children to support their families by working from adolescence. Second, they have to stay seven months at work and the remaining five months in their villages.

There are more problems in the lives of these workers. Bituminous coal (which is mainly used as fuel in brick kilns) comes to Gabtali and Aminbazar Ghats of Turag River. These coals are imported from Indonesia and Africa.

It is also used as a fuel for garment boilers and some factories but in very small numbers. When the rainy season starts, brickyards remain closed. Then the import of coal also remains shut. Coal workers remain out of work then.

There are around 4,500 brick kilns in Dhaka and nearby districts. These brickfields depend on the coal coming to Gabtali. Each brick kiln burns around 8 lakh bricks in one round or at a time. It takes 150 metric tons of coal. On an average of 8 rounds of bricks are burned in one kiln per season. As such, a brick kiln requires 1,200 metric tons of coal. 4,500 brick kilns require 54 lakh metric tons of coal. The import value of this coal is about 540 million Taka. Coal imports are increasing every year.

Syeda Rizwana Hasan, chief executive of Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA), told Prothom Alo that burning coal to make bricks is harmful to the environment. Low-quality imported coal is being used in brick kilns. This coal contains a higher amount of sulfur. The government says it will stop using coal in the brickyard, but allows imports. In addition to that, many workers do not know about health risks. There are many women among these workers.

Abdul Aziz (50) of the Keblarchar area said that he came from Shahjadpur in Sirajganj a month ago. After working on coal for a month, he is having breathing problems. He did not have such a problem before. He is thinking of returning to the village. Prothom Alo talked to a few more such workers. They said none of them had ever mentioned the risks involved in coal work. Eight workers who have worked in coal for at least one season (seven months) said that although they did not have any physical problem before, now they are suffering from coughing. Sometimes they face difficulties in breathing.

Kazi Saifuddin Bennur, a doctor of the National Institute of Diseases of the Chest and Hospital (NIDCH), told Prothom Alo that when such dusts enter the lungs, it causes shortness of breath, the liver and kidneys become weaker and weaker. Working hours are also not specified here.

Some coal workers told Prothom Alo that they have to work 12 hours a day from 5 am to 5 pm. However, they do not get paid as hours. They get a token for every basket of unloaded coal and get three takas against each token. The tokens were given by the agents of the labor chiefs. The tokens were given by the representatives of the labor chiefs. A worker can earn around 800 taka against a day's hard work.

Sardar Mojibur Rahman, a labor chief from Kebalachar, said there were no working hours here. If anybody does not carry the basket of coal, he does not have money.

Gautam Kumar, director-general of the labor department, told Prothom Alo that loading and unloading of coal are very unhygienic and risky. To ensure the protection of workers of such an informal sector, it is necessary to include them under labor unions or trade unions. When asked whether the informal sector workers have the opportunity to form trade unions, he said that whether it is formal or informal, the workers can unite and apply for trade unions and they are also given approval. It helps them to bargain with the owner. When there is no union, their opportunities become limited.

In Gabtali and Aminbazar areas, more than 50 private companies sell coal to the brick kilns. Noor Enterprise is one of them. Delwar Hossain, the proprietor of the company, told Prothom Alo that labor chiefs supervise the work of unloading coal. They ensure health and safety to the workers.

Prothom Alo talked to three labor leaders about this issue. They said they were unaware of the health risks of coal work. None of them ever informed us anything about it. There are no instructions in this regard.

Professor Ahmed Kamruzzaman Majumder, chairman of the Department of Environmental Sciences at Stamford University and founding director of the university's Center for Atmospheric Pollution Studies (CAPS), told the daily Prothom Alo that coal is a kind of black carbon. The dust enters the body of the coal workers in three ways “through breathing, through the mouth, and the hair pores”.

This carbon causes infection in the lungs, which is one of the causes of shortness of breath. In many cases, the combination of carbon in the blood can lead to blood cancer. If anybody works with coal for a few years, he/she no longer has the physical ability. As it is a risky profession, coal workers need to undergo regular health check-ups.

Energy expert Professor M Tamim said coal workers around the world are victims of "coal dust poisoning". When dust enters the lungs, it causes severe damage. Special masks should be used to prevent dust from entering the body.

Workers become climate refugees in city

Bangladesh remains among the top in the list of countries at risk of climate change. As a result, it's facing losses silently. The workers here are the main direct victims of climate change. But there is very little talk about climate change, rehabilitation initiatives, or concerns and discussion about the workers. This issue is almost missing, the year 2021 was no exception. Although the movement of such refugees was limited at the beginning of this year due to Covid-19 pandemic, it started after the lockdown was lifted. Now it is evident that the arrival of such refugees in the cities has gained special momentum. City slum areas are overflowing with workers again.

It is worth mentioning that due to climate change, around 600 million people in the coastal areas of the world are under threat in the current century. At present around forty million people are being displaced from their old habitats every year due to climate change. Apart from violence, clashes, etc., people are now leaving their area mainly due to the weather.

Due to rising temperatures, droughts, floods, etc., including rising sea levels, the number of refugees is expected to increase further in the future, according to various research reports. Most of the potential refugees will be in Asia and Africa. An organization, American Geophysical Union has estimated in a study that by 2050, as the sea level rises, along with other countries a large number of Bangladeshi workers will have to migrate to other regions. The number of such people can be millions.

Their research also says that the migrant workers will choose Dhaka first, as it is the main center of internal migration in Bangladesh. This will increase the population pressure in the capital. Due to the pressure of the population, many will leave the capital

also. Then some climate refugees will enter other parts of the country. However, the second phase has not started yet in Bangladesh. The latest picture shows that the population pressure in the villages of Bangladesh is decreasing gradually. On the contrary, it is growing rapidly in the cities. In other words, it can be said that the migration of population due to climate change has started here.

The Daily Star (15 September 2021), quoting a report of the World Bank, wrote that by 2050, approximately 13 million people in the coastal areas of Bangladesh will have to leave their old homes and seek shelter elsewhere. According to the World Bank, Bangladesh will account for 37% of the climate refugees in South Asia.

One of the major reasons for this is the crisis in employment in the agriculture sector due to climate change. Nature is intensifying the refugee crisis and will do further. Many experts have said that due to rising sea level, the salt water has overflowed the coastal area and reached Goplaganj district. Earlier, many districts in the south including Khulna, Bagerhat, Satkhira, Patuakhali and Pirojpur were grabbed by salt water. As a result, agriculture is being ruined and crop lands are losing their fertility. Those who depend on agriculture are being forced to change their profession. The biggest issue is that people are in a crisis of drinking water. One cannot live long without pure drinking water. Again the situation is getting worse day by day.

A BBC report, published on September 15, 2021, mentioned that temperatures exceeded 50 degrees Celsius for an average of 14 days a year from 1980 to 2009. And from 2010 to 2019, this number stands at 26 days per year. That means climate change is a harsh reality now. And everyone must be ready to see the impact of this change unless the people change the types of their consumption and compromise with nature.

If global warming continues at the current rate, not only climate change but also global warming will affect 1.2 billion people worldwide by 2100. The workers will be the worst victims of such a disaster. This is because the workers in the informal sector often have to work long hours in the sun and rain. Formal sector workers are also no less prone to temperature-related losses. One of the major reasons for the deficiencies in the productivity of workers in Bangladesh is rising temperatures.

According to a report of the daily Prothom Alo on September 6, 2021, the performance of inhabitants of Dhaka has decreased the most in the world due to the effect of global average temperature rise. Due to the high temperature, the workers of this city are able to work less than their usual ability. Similar situations prevail in other cities like Comilla, Chattogram and Sirajganj. When the temperature in a city is usually above 30 degrees, it is called extreme high. Due to the increase in population, the trees and plants in the cities of Bangladesh are declining. The concrete structure is increasing and the weather is also becoming 'extreme' silently.

From the island to the slums

How climate refugees are coming to Dhaka can be better understood from a report by Deutsche Welle. According to the report, there is a slum named Bholapara in the Mohammadpur area of Dhaka. Those who are victims of river erosion in different areas of the Bhola district of the south of Bangladesh, come here and take shelter. Hundreds of families from Bhola have taken shelter in this slum. That is why the name of this slum has become 'Bholapara'. They have been coming for the last few years. Some have moved to

other slums in Dhaka. According to those who came to Dhaka from Bhola after being affected by river erosion, their first address in Dhaka is now this Bholapara slum.

According to the Internal Displacement Monitoring Center, an average of one million people by floods, ten thousand people by cyclones, and more than one lac people might be displaced by tsunamis and hurricanes in the coming years. Other than that, disasters like earthquakes can make the situation worse.

But the question is where will these refugees go? Where will they stay and what will be their employment? A part of them may come to the capital every year. Is Dhaka ready at all for their rehabilitation? How many Bholapara will contain this capital? The most worrying aspect is that to accommodate such migrant refugees the bargaining power of the workers in the labor market will also decrease. This will create a new vicious cycle of poverty. Meanwhile, economists are reporting an increase in the number of 'new poor' in the country. The vast majority of these new poor are actually climate refugees.

Experts are recommending many things to do in this context which includes reducing carbon emissions as an initial and permanent step. Bangladesh's transport sector, industry, various types of power plants, brick kilns, etc. are huge sources of carbon emissions. Apart from these, experts are also making two more special recommendations.

First, to make the nature of development and employment in Bangladesh environment friendly; take additional protection for natural resources including Sundarbans. Second, to increase development initiatives and social security programs in the slum areas of the city and to focus more on their employment-oriented rehabilitation. But is Bangladesh doing what it needs to do to mobilize national resources?

Children from workers' families also victims of climate change

A study, conducted by the International Children's Fund (UNICEF) in 2019 on the effects of climate change on children, said that the lives of more than 19 million children in Bangladesh are directly at risk due to climate change. Most of them are children of workers' families. UNICEF Executive Director Henrietta Fore said at the time, "Climate change poses a greater risk to the poor in Bangladesh. They can't feed the children enough, they can't keep them healthy. Their education is being disrupted."

The increase of natural disasters means that the affected families are becoming poorer than before. When they lose their homes, their children are forced to join any work to earn money. Thus they lose their educational life. One of the major causes of child marriage is the effect of climate change. Thus, climate change is making poverty a permanent feature in the lives of the working people of the country.

Safety & Rights

Promoting Safety, Protecting Rights

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি

৬/৮ এ স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল: +৮৮ ০১৮৭৩৩৬৬৬১৮০

info@safetyandrights.org

www.safetyandrights.org

Safety and Rights Society

Safety and Rights Society